সপ্তপর্ণ

রাখালচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

সপ্তপর্ণ

প্রথম সংস্করণ ... আশ্বিন, ১৩৪৪

মূল্য—২৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৯৭ সালের চৈত্র মাসে, মৃত্যু ১৯৩৪ সালের পৌষে। ৩৭ বৎসরের একটি জীবন বৈচিত্র্যহীন সাধারণ জীবনের পক্ষে হয়তো সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু কর্ম্মবহুল, প্রতিভাদীপ্ত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় একটি জীবনের আকস্মিক পূর্ণচ্ছেদ,—ইহা সত্যই বড় সংক্ষিপ্ত মনে হয়।

খুলনা জেলার সামান্য একটি গ্রামে অতি সাধারণ গৃহস্থের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যহীন বাল্যকালের পর গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তীক্ষ্ণ মেধাবী বালক অসীম অধ্যবসায়ে সাধারণের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১৯ সালে ইতিহাসে এম্. এ. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও সেই বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মনোনীত হন। দুই বৎসর অক্সফোর্ডে কাটাইয়া ১৯২১ সালে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন।

তারপর তের বৎসর বাংলার নানা জেলায় সসম্মানে বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৪ সালে আলিপুরের এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ওঁ

সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম গল্পটির নাম : সহযাত্রী। কিছুকাল পূর্বে এটি পড়েছিলুম পরিচয় পত্রে। এ জাতের গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি প্রশংসনীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমক লাগানো নাট্যবিন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরো বেশি লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্ছে ঘটনার যাথার্থ্য, আখ্যানটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যে এটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পরে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। লেখকের খবর নিতে গিয়ে জানলুম তিনি বাঙালি সিভিলিয়ন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর জানা আছে। কিন্তু জানা থাকলেই যে জানানো যায় তা নয়। তাঁর এই পাকা হাতের কাজ দেখে আশা করেছিলুম যে বাংলায় গল্পরচনায় নূতন পথযাত্রীর অভ্যুদয় হয়েছে। তার অল্পকাল পরেই তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ জানতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলুম। সম্প্রতি বইখানিতে তাঁর লেখনীর আরো কিছু পরিচয় [illegible] হয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে থাকলে যা আশা করা যেতে পারত তার থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হোলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

সহযাত্রী

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু গোধূলির আলো তখনো স্পষ্ট। ফ্রান্সের যে অংশের মধ্য দিয়া গাড়ি ছুটিতেছিল, এমন সুন্দর দেশ আমি খুব কম দেখিয়াছি। সমতল নয়, অথচ পাহাড়ে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া যায় না। দুধারে একরকম লম্বা ঘাসে ভরা মাঠ, আর কেবল বন। শরৎশেষে ঝরিবার আগে পাতায় পাতায় এক অপূর্ব্ব রং ধরিয়াছে। বিন্দু-মাত্র বাতাস নাই। সমস্ত প্রকৃতি যেন ছবির মতো নিস্পন্দ ও স্বপ্নের মতো অলীক—জোরে বাতাস দিলে যেন মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে।

দেখিয়া দেখিয়া চোখ ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। ক্ষয়ের প্রারম্ভের রূপের মাঝে কী মোহ আছে জানি না। থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে পড়িতেছিল আমাদের দেশের ফুলঝুরি নদীর কথা। জোয়ার আসিয়া নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিলে কিছুক্ষণ আর স্রোত থাকিত না, ঢেউ উঠিত

না। আপন পরিণতিতে সে প্রবাহিণী এক অপরূপ শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিত। তার পর ভাঁটার টান ধরিত।

অথচ মনের একাংশে ভালোও লাগিতেছিল না। সমস্ত দিন গাড়িতে একাকী। বুলয়েন-এ উঠিয়াছিলাম সকাল প্রায় নয়টার সময়—আর তার পরদিন প্রায় দশটার সময় জেনোয়াতে নামিবার কথা। আমাদের কয়েকখানি গাড়ি প্যারিসে এই ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে। যাত্রী বেশি ছিল না। সবগুলিই ঘুমাইবার গাড়ি। "রেস্তোরাঁ-কার" অবশ্য ছিল, এবং সেখানে মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় সহযাত্রীদের দেখিয়াছি। মাত্র আট-দশ জন। তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের কথা আমার আজও মনে আছে।

এক ছিলেন এক তরুণ দম্পতি। বোধহয় "হানি মুন"-এর যাত্রী। ক্ষণে ক্ষণে তরুণীটি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন এবং চোখে চোখে পড়িতেই ঈষৎ হাসিতেছিলেন। স্বামীটি টমাস্ কুক্-এর প্রণীত ভ্রমণ-পঞ্জী মন দিয়া পড়িতেছিলেন এবং বোধহয় দায়িত্ববোধের নূতন উপলব্ধিতে তাহারি এক কোণে তাঁহাদের ব্যয়ের হিসাব লিখিতেছিলেন। তরুণী তনুদেহা, সুকেশী ও সুন্দরী। মুখের গড়নে ও কেশবিন্যাস-ভঙ্গীতে রম্‌নী-র আঁকা লেডি হ্যামিল্‌টন্-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছু দূরে একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন একটি বৃদ্ধা, আর নার্সের পোষাকে তাঁহার সঙ্গিনী। বৃদ্ধা খাইতেছিলেন ও নার্সটি বৃদ্ধার পুরাতন ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেছিল। বৃদ্ধার যে

সব অংশ শুনিবার ইচ্ছা তাহা সব এক খাতায় ছিল না। নার্স টিকে বারে বারে উঠিয়া যাইতে হইতেছিল, অথচ তাহার মুখে হর্ষ-বিষাদ বা তৃপ্তি-বিরক্তি কিছুরই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। যেন কলের পুতুল কলে চলিতেছে।

ইঁহাদেরই পরের টেবিলে বসিয়াছিলেন আর একটি মহিলা। তাঁহাকে দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা কিছু শক্ত। বোধহয় ত্রিশের উপর হইবে। দেখিলে মনে হয় বোদ্‌লেয়র্-এর মানস-লোকের কোনো মূর্ত্তি সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে। যেমনি দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত, দৃঢ় দেহ আর আয়ত চোখ। ইয়ারিঙ দুটি অদ্ভুত রকমের, কাঁধে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আদিম-জাতির মতো কর্ণ-সজ্জার জন্যই হোক্ আর অন্য কোনো কারণেই হোক, মুখের মধ্যে যেন একটা নিষ্ঠুর শক্তির ব্যঞ্জনা ছিল। ইঁহার পাশে তরুণীটির কোমল লাবণ্য যেন স্বাদহীন ও অর্থশূন্য।

তাহার পর কয়েকটি টেবিল খালি ছিল। সর্ব্বশেষের টেবিলে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইলে তাঁহাকে প্রৌঢ় বলিতাম। তাঁহার চেহারায় শুধু তাঁহার চোখ দুটি ছাড়া আর কোনো বৈলক্ষণ্য ছিল না। চোখ দুটি যেন পৃথিবীতে অফুরন্ত কৌতুক খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং অপরকে তাহা জানাইবার জন্য ব্যগ্র। ভদ্রলোককে দেখিলেই মনে হয় তাঁহার ক্ষুধা ভালো হয়, আহার ভালো জোটে এবং নিদ্রার জন্য বেগ পাইতে হয় না।

সান্ধ্যভোজে আমার যাইতে কিছু দেরি হইয়াছিল।

কিন্তু শেষোক্ত ভদ্রলোকটি আমারও পরে আসিলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া টেবিলেই বসিলেন। তখন আর সকলে শেষ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে।

ভদ্রলোককে শেষ অবধি আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যে জিনিস ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো যায় না, এবং যাহার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা সন্দেহ, ভদ্রলোকের তাহা ছিল—charm। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমার সহিত অনেকখানি আলাপ করিয়া লইলেন। অথচ তাঁহার মধ্যে ইতর কৌতূহল বা অযথা ঘনিষ্ঠতা কিছুই ছিল না। আমার বয়স তাঁহার অপেক্ষা অনেক কম ছিল। অনেক কথা তিনি আমাকে উপদেশের সুরে বলিতেছিলেন এবং আমি কোনো প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাঁহার চোখে একরূপ হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল—ভাবটা যেন "আমি বেশ জানি যে পৃথিবীর যত বুদ্ধি ও জ্ঞান আমার সহিত ফুরাইয়া যাইবে না। শুনিলেই না হয় আমার কথাগুলি, ইচ্ছা হয় কাল ভুলিয়া যাইয়ো।"

তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীটা ছিল কিছু বিশেষ রকমের। এক কথার শেষ হইতে না হইতে হিতোপদেশের 'কথমেতৎ'-এর মতো অন্য কথা পাড়িতে ছিলেন। তবে মূল কাহিনী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছিল না। তারপর অনেক সময়ে আমার দিক্ হইতে অনেক আপত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া সেগুলি খণ্ডন করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ কথা হইতেই আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে

আমি ছিলাম উপলক্ষ্য মাত্র। সেই যাত্রায় সেই সব কথা তাঁহার কাহারো কাছে বলা আবশ্যক ছিল। আমি কতটুকু বিশ্বাস করি, বা তাঁহার মত্ কতটুকু গ্রহণ করি, সেটা তাঁহার নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না।

খাওয়া শেষ হইতে তিনি ওয়েটার-কে দু গ্লাস আব্‌স্যাং আনিতে বলিলেন। আমার জানাইতে হইল যে সুরাপান করা আমার অভ্যাস নাই। তিনি আমাকে ধূমপান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও করি না শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "কোনো রকম বদভ্যাস নাই। এটা ভালো কথা নহে। একটা কিছু আরম্ভ করো! নতুবা জীবনে বন্ধু পাইবে না।"

আমি উত্তর দিলাম "বন্ধুলাভের জন্য যে এ সব করিতে হয়, ইহা তো আমার জানা ছিল না।"

সহযাত্রী আমার জন্য জিঞ্জার বিয়ার আনিতে বলিলেন ও আমাকে কহিলেন—"আমার সহিত সমান বেগে পান করিলে কাল ভোরের আগে তুমি জিঞ্জার বিয়ারের ভিন্‌টেজ-ইয়ার (vintage years) সম্বন্ধে পণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর বন্ধুত্বের কথা বলিতেছিলাম এইজন্য যে নিখুঁৎ মানুষকে সবাই সন্দেহ করে। সন্দেহটা অহেতুক নয়। মানুষের পক্ষে নিখুঁৎ হওয়া এত অস্বাভাবিক যে বাহির নিখুঁৎ দেখিলে ভিতর সম্বন্ধে একটা সন্দেহ মানুষের স্বতঃই মনে আসে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি 'সিনিক'?"

সহযাত্রী হাসিলেন, বলিলেন "না 'সিনিক' আমি নই। ঠাট্টা করিতে ছিলাম! কিন্তু সকলের চেয়ে আমি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করি নিজেকে। সময়ে সময়ে মনে হয় আমার মধ্যে দুজন লোক আছে। একজন দেখে ও আর একজন করে। প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে অসীম কৃপার চক্ষে দেখে ও হাসে। এ হাসি মনের টিঞ্চার আয়োডিন, এ যে পাইয়াছে তাহার সিনিক হওয়া অসম্ভব।"

তারপর বোধহয় অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্প্যানিশ জানো?"

আমি কহিলাম "না।"

"তোমার শেখা উচিত, সহজ ভাষা। তারপর কাল্দেরন পড়িতে পারিবে। সে ছন্দ, সে ঝঙ্কার, সে গাম্ভীর্য্য পৃথিবীর আর কোনো কবিতে পাইবে না। স্পেনে গিয়াছ নিশ্চয়।"

স্বীকার করিতে হইল যে স্পেনেও আমি যাই নাই।

তিনি কহিলেন "আবার যখন ইউরোপে আসিবে স্পেনে যাইয়ো। কিছুদিন সেভিল্-এ থাকিয়ো। সৃষ্টির সেরা সুন্দরী নারী দেখিবে। আল্হাম্ব্রা, কর্দোভা এ সবই একদিন হয়তো আমরা ভুলিব, কিন্তু এই অলোকসামান্য রমণী-রূপ আমাদের চিরদিন মূরদের নিকট ঋণী রাখিবে।

—কিন্তু তাহাদের সহিত খেলিতে যাইয়ো না। তাহারা তোমাদের প্রাচ্য দেশের নারী নয় যে প্রদীপের সলিতার মতো একটু একটু করিয়া নিজেকে ক্ষয় করিবে, তবু কখনো

অগ্নিকাণ্ড করিবে না! বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিয়ো।”

প্রাচ্যনারীর প্রতি এ ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে নাই। কহিলাম “স্প্যানিশ নারী বিবাহ করিবার মতো উচ্চাশা আমার কিছুমাত্র নাই, আর প্রাচ্যদেশের নারী সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা কী করিয়া হইল?”

সহসা তিনি গম্ভীর হইলেন। এমন কি তাঁহার চঞ্চল চোখের হাসিও যেন থামিয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিলেন—“অসন্তুষ্ট হইয়ো না। আমার কথা বলিবার ভঙ্গীই ঐ। যখন যাহা বলি কিছু অতিরিক্ত জোরের সহিত বলি। সব দেশেই সব রকমের স্ত্রীলোক আছে। এই যে সেভিল-এর সুন্দরীদের কথা বলিতেছি ইহারাও লণ্ডনের কুয়াশাবৃত পথে তোমার চোখে সুন্দরী মনে হইবে না। তাহাদের দেখা চাই তাহাদের স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে—সেই উজ্জ্বল রৌদ্র, সেই কঙ্কর-রাঙা পথ ও সেই ফলভরা কমলা-গাছের সারি। তাহারি মাঝখানে তাহাদের না দেখিলে বুঝিবে না সেই কালো চুলের ও কালো চোখের ছায়ার কী মায়া।

স্পেনে গিয়া একদিন ‘বুল্ ফাইট্’ দেখিতে যাইয়ো। সেদিন সাধারণত একটি উৎসবের দিন থাকে। দলে দলে ছুটির সাজে মেয়েরা আসিবে, দেখিবে তাহারা প্রত্যেকেই রাজরাণী হইবার যোগ্য!”

ইহার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা হয় নাই। অনুভব

করিলাম তর্ক উঠাইয়া আমি রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছি। সহযাত্রীকে খুসী করিবার জন্য কহিলাম—

"আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন।"

ইংরেজি সত্যই তিনি ভালো বলিতেছেন তবে তাহাতে বিদেশী-সুলভ টান ছিল। তিনি উত্তর দিলেন "আমি বহুদিন ইংলণ্ডে আছি। বুঝিতেই পারিয়াছ আমার জন্ম স্পেনে। সেখানে আমার কৈশোর অবধি কাটে। তার পর কিছুদিন ফ্রান্সে ছিলাম। তার পর হইতে বরাবর ইংলণ্ডেই আছি।"

"আপনি স্পেনে ফিরিবেন না?"

"সম্ভাবনা কম, আমার কারবার ইংলণ্ডে।"

"চিরদিন এইরূপ বিদেশে থাকিতে ভালো লাগিবে?"

সহযাত্রীর গ্লাস কিছু আগেই শূন্য হইয়াছিল। আর এক গ্লাস আনাইয়া লইয়া কহিলেন "সবি সহিয়া আসে। ইংলণ্ড আমার মন্দ লাগে না, আর জাতি হিসাবে ইংরেজদের আমি শ্রদ্ধা করি—সুতরাং কষ্ট বিশেষ কিছু নাই।

শ্রদ্ধা করি এইজন্য যে তাহাদের যাহা আছে আমাদের তাহা নাই। যদি কখনো জানিতে চাও যে একজনের মধ্যে কী নাই, তবে সে যাহাদের পছন্দ করে তাহাদের খোঁজ করিয়ো। আর যদি জানিতে চাও সে সত্যই কী প্রকৃতির, খোঁজ করিয়ো তাহাদের যাহাদের সে খুব বড়াই করিয়া ঘৃণা করে। কী জানো—ঘটনাক্রমে—কোনো জাতি সাম্রাজ্যের

অধীশ্বর হইতে পারে। কিন্তু শক্তিমান ও বুদ্ধিমান না হইলে সাম্রাজ্য কেহ রাখিতে পারে না।"

আমি কহিলাম "সাম্রাজ্য তো আপনাদেরও একদিন ছিল। আপনাদের জাতিও তো একদিন অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর ছিল—"

"ছিল সত্য, কিন্তু সেদিন হয়তো আমাদের চরিত্রও অন্য-রকমের ছিল। কখনো বিশ্বাস করিয়ো না যে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। যে দিন প্রতি স্পেনীয় পরিবারের অর্দ্ধেক পুরুষ থাকিত হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর নানাস্থানে, যখন প্রবাসে তাহাদের চলিতে হইত বিজয়ীর গর্ব্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, তখনকার দিনে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই অন্যরকমের ছিল।

কেন যে জাতির উত্থান বা পতন হয়, আমি জানি না—তবে ইংরেজদের আমি শুধু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা করি না। কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের শক্তি অদ্ভুত। সব চেয়ে মূর্খ ইংরেজকে কোনো একটি শক্ত বিপদে ফেলিয়া দেখিয়ো ইহাদের শক্তির মূল কোথায়। তাহাদের চিন্তাশক্তি প্রখর নয়, প্রকাশের ক্ষমতা সাবলীল নয়, কিন্তু বিপদে সংগ্রামে যদি সাথী খুঁজিতে হয়, তবে ইংরেজের চেয়ে ভালো সাথী কেহ নাই।

অপূর্ব্ব সাহস এ জাতির। তোমাকে বোধহয় এখনো বলি নাই গত মহাযুদ্ধে আমি ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়াছিলাম। খুব বেশি দিন আমাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই,

না হইলে হয়তো আজ এখানে বসিয়া তোমার সহিত গল্প করিতাম না। অনেকগুলি ভাষা জানি বলিয়া শীঘ্রই আমার উপর অন্য রকমের কাজের ভার পড়ে। কিন্তু সোম্-এর যুদ্ধে আমি ছিলাম। তখনো বোধ হয় ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ সকলে বোঝেন নাই যে জার্ম্মানদের পরিখাগুলি কিরূপ সুরক্ষিত ছিল, এবং তাহা নষ্ট করিবার জন্য কী শ্রেণীর গোলাগুলির প্রয়োজন।

কিছুকাল ধরিয়া আমাদের পক্ষ হইতে যে ভীষণ বম্বার্ড্‌মেন্ট্‌ চলিল, তাহার পর ভাবিতে পারি নাই যে শত্রুপক্ষের সম্মুখের দিকের পরিখায় কেহ জীবিত আছে। 'বারাজ্‌' উঠাইয়া দূরে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিল। এক মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইল শত্রুপক্ষের অসংখ্য মেশিনগানের অজস্র গুলিবৃষ্টি। তাহাদের গোলন্দাজেরা আগেই আক্রমণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। এক এক দল ইংরেজ পড়ে—যেন কোন্‌ অদৃশ্য কৃষকদল নিপুণ হস্তে তৃণ কাটিতেছে—আবার আর এক দল আক্রমণ করে। চারিদিক হইতে আসে আহতের আর্ত্তনাদ, ইংরেজ-অফিসারদের উচ্চ-কণ্ঠে প্রদত্ত আদেশ ও উৎসাহবাণী, মেশিনগানের শব্দ ও কামানের গর্জ্জন। মনে হইতেছিল এ তো যুদ্ধ নয় যেন কোনো মহাদানবের পূজায় লক্ষবলি।

যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলে কি ?"

বলিলাম "না"। এইখানে এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি

যে আমার অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল এবং বলিতে পারি নাই এ কারণে আমার চির-জীবনের একটি আক্ষেপ রহিয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কিরূপ এককালে হেলায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলাম, আমাদের প্রাচীন যৌধেয় জাতির মধ্যে কিরূপ গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমাদের দেশে মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হইলে প্রজাশক্তি কিরূপে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল, আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি—এ সবের কিছু কিছু আমার বন্ধুটিকে জানাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। জানাইতে পারি নাই তাহার প্রথম কারণ ভয়। যদি লোকটি আমার চেয়ে এ সব বিষয় ঢের বেশি জানে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকটিকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ—একটা লজ্জার ভাব। এজন্য নিজের উপর অনেক দিন বিরক্তি আসিয়াছে এবং এ লজ্জার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। তৃতীয় কারণ—এবং এইটিই শ্রেষ্ঠ কারণ—আমার এই দোদুল্যমান মন স্থির করিতে না করিতে বন্ধু আবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখ আমার আজিও যায় নাই। তর্কে বা কলহে যে উত্তর দিলে জয় অবশ্যম্ভাবী, সে উত্তর যখন বহুপরে হঠাৎ মনে আসে, অনেকটা সেই মনের অবস্থা লইয়া অনেকদিন আশা করিয়াছি যে একদিন না একদিন আমার সেই সহযাত্রীর সহিত আবার দেখা হইবে।

বন্ধু কহিলেন—"কেমন করিয়াই বা দিবে—যুদ্ধের সময় তো তুমি নিতান্ত বালক ছিলে। তবে তোমার কাছে এ

বিষয়ে কোনো অতিরঞ্জন করিতে চাই না। বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালী যে রকম, তাহাতে বীরত্বের প্রশ্ন খুব কম ওঠে। সময় মতো যদি নিজের পরিখা ছাড়িয়া না ওঠো, তবে হয় মরিবে শত্রুর গোলায়, না হয় মরিবে নিজের অফিসারের রিবলভারে। তার পর ঠিকমতো যদি অগ্রসর না হও, মরিবে উভয়-পক্ষের গোলায়। যদি কোনো মতে কোথাও লুকাও বা পালাও, হয়তো তারপর দিনই আপন-পরিবারের মাথায় কাপুরুষতার কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া দিয়া জীবন-লীলা শেষ করিবে নিকটতম কোনো প্রাচীরের কাছে।

এ কথাও ঠিক যে অন্য জাতির সৈন্যেরাও কম সাহস দেখায় নাই। অস্ত্র নাই, গুলি নাই, খাদ্য নাই—এ অবস্থায় রাশিয়ার সৈন্যগণ যাহা করিয়াছে, যাহা সহিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তবু আমি বলিব, ইংরেজদের সাহস অপূর্ব্ব, মৃত্যুকে লইয়া তাহারা খেলা করিতে পারিত। মনে পড়ে সোম্-এর যুদ্ধের কিছু আগে একদিন আমি আমার কোম্পানী পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। ট্রেঞ্চ্-এর এক অংশে গিয়া দেখি কয়েকজন সৈন্য মহানন্দে তাস খেলিতেছে। আমাকে দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা। কী খেলা জিজ্ঞাসা করিতে প্রথম কেহ কিছু উত্তর দেয় না। অনেক প্রশ্নের পর জানিতে পারিলাম ব্যাপারটা কী। মৃত্যুকে লইয়া তাহারা জুয়া খেলিতেছে। প্রত্যেক তাসের উপর একজনের নাম লেখা আছে। যাহার নাম একজনে টানিয়াছে সেই লোকটি যদি পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিহত হয়, তবে যে

টানিয়াছে তাহাকে আর যে ক'জন বাঁচিয়া রহিবে তাহারা দুই শিলিং করিয়া দিবে। দুইজনেরই মৃত্যু হইলে ব্যবস্থাটা কী হইবে তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসি—কিন্তু হাসিয়াছিলাম কাঁদা অসম্ভব ছিল বলিয়া।

বালকের দল—ওরা কখনো পরিণতবয়স্ক হয় না। ওদের যাহা কিছু দোষ তাহারও মূল সেইখানে। ছেলেবেলায় যখন স্কুলে যায়, তখন বড়ছেলেদের অত্যাচারে শেখে নিজের উপর নির্ভর করিতে। ধারণা হয় যে হৃদয়াবেগ সহসা প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে হাস্যকর কাজ। আর শেখে ভদ্রলোকে কী করে আর কী করে না। সারা জীবন সে শিক্ষা ভোলে না। যতদিন নিজেদের মধ্যে থাকে, ততদিন বিশেষ গোলমাল হয় না। কিন্তু পরকে ওরা সহজে বোঝে না। ওদের কাছে একজন লোক হয় ভালো না হয় মন্দ। একটা জাতি হয় শ্রদ্ধার যোগ্য, না হয় শ্রদ্ধার যোগ্য নয়—এমনি করিয়া ওরা জগৎ সাদায় কালোয় ভাগ করিয়া লয়। বিধাতার তুলিতে আর যত রঙ্ আছে সেগুলি ধরিতে ওদের দেরি হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"উহাদের বণিক মনোবৃত্তির কথা শোনা যায় যে—"

বন্ধু কহিলেন—"কোন্ জাতি বণিক নয়? এতকাল তো শুনিয়াছি তোমাদের মস্‌লিন না হইলে রোমের বিলাসিনীদের মন উঠিত না। বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থাই এই যে

যেখানে প্রভুত্ব নাই, সেখানে বাণিজ্য নাই। একমাত্র ইংরেজ তো তোমাদের দেশে বাণিজ্য করিতে যায় নাই—তবে উহারাই রহিয়া গেল।” তারপর একটুখানি নীরব রহিয়া বলিলেন “ওসব অপবাদের কোনো মূল্য নাই। ইংরেজ প্রবল জাতি, প্রবলের যাহা প্রাপ্য তাহা ভোগ করিতেছে। মানুষের চরিত্র না পরিবর্ত্তিত হওয়া অবধি এইরূপই চলিবে। কিন্তু ওরা জীবনের কারুকার্য্য বোঝে না। এই দেখো না ওদের প্রিয় খাদ্য বীফ্, আর সেরা পানীয় বিয়ার। গরীব ফরাসীও কোনো না কোনো ওয়াইন্ খায়, তাতে মত্ততা আনে না, পিপাসা নিবারণ করে না, কিন্তু আসে স্বপ্ন।”

এটা আমার নিতান্ত গায়ের জোরের কথা মনে হইয়াছিল। কহিলাম—“যে জাতের মধ্যে এত কবি, এত শিল্পী, তাহার সম্বন্ধে আপনার বর্ণনা ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না।”

বন্ধু হাসিলেন—যেন এই কথাটিরই অপেক্ষা তিনি করিতেছিলেন—বলিলেন “একটা জাতির সম্বন্ধে কোনো কথা কি সর্ব্বাংশে খাটে কখনো? খুঁজিতে হয় তার প্রাণ। তবে তুমি ঠিক্ প্রশ্নই তুলিয়াছ। ইংরেজের মধ্যে একটি ভাবপ্রবণতা ও আদর্শবাদের ধারা আছে, যাহা তাহারা সচরাচর অতি অন্তরালে রাখে কিন্তু দু’ একটি জিনিসে তাহা বেশ ধরা পড়ে। প্রতি জাতের মধ্যেই কিছু পরিমাণে গোপন প্রণয় আছে। হয়তো অনেক উপন্যাস পড়িবার সময় তোমার মনে হইয়াছে যে বস্তুটি ফরাসী জাতির বিশেষত্ব।

কোনো ফরাসী গ্রামে'গিয়া কিছুদিন বাস করিলে বুঝিবে এ কথা কত অসত্য। এমন পরিশ্রমী, সমাজভীরু ও রক্ষণশীল জাতি খুব কম আছে। তাইই বোধ হয় ফরাসী-বিপ্লব এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল!

কিন্তু কিছু পরিমাণে আছে তো। তবে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ফরাসী নারী বা কোনো ল্যাটিন নারী নিজের পরিবার ভাঙে না। তাহার কারণ শুধু ক্যাথলিক ধর্ম্ম নয়। জীবনের এই সব আত্ম-বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলির প্রকৃত মূল্য কী সে তাহা বোঝে। যাহা স্থায়ী—স্বামী, সংসার, সন্তান—এ সব সে ভাসাইয়া দেয় না। কিন্তু প্রণয়ীকে গোপনে সে নিজের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দেয়। আর ইংরেজ এরূপ ক্ষেত্রে অনুভব করে যে বিবাহিত জীবনে ভিন্ন প্রণয় অন্যায়, অস্বাভাবিক,—তাই বিচ্ছেদ-মোকদ্দমা, সন্তান লইয়া কাড়াকাড়ি—এ সবে তাহার জীবন কলহ-তিক্ত হইয়া উঠে।"

আমি কহিলাম "সত্যভঙ্গের কথা প্রকাশ করাই তো ধর্ম্মবুদ্ধির কাজ; আর প্রেম যেখানে নাই সেখানে প্রেমের অভিনয় তো এক ভয়াবহ ব্যাপার। ল্যাটিন নারী যখন জানে জিনিসটি স্থায়ী হইবে না, তখন সে যদি প্রণয়ীকে ভালোবাসে মনে করে, তবে কোনো পক্ষকে না কোনো পক্ষকে ভীষণ প্রবঞ্চনা করে।"

বন্ধু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না এবং একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু গম্ভীর সুরেই কহিলেন "তোমার মুখে একথা শুনিয়া সুখী হইয়াছি।

বয়স যখন তোমার মতো ছিল, তখন আমারো মত ঐ ছিল এবং থাকা উচিতও। আজো যে আমার মনের কোনো অংশ তোমার কথায় সায় দেয় না, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী জানো—একটা জিনিসকে অনেক ভাবে দেখা যায়, এই সত্যটি গ্রহণ করা। ল্যাটিন নারী যদি প্রবঞ্চনা করে কাহাকেও, সে নিজেকে। বলিবে সেটি সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখো,আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া এই জগৎ কি এক মুহূর্ত্ত চলিত? নিসর্গসুন্দরী আমাদের এ দুর্ব্বলতাটি বেশ জানেন, এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আমাদের দিয়া অনেক কাজ করাইয়া নিয়া থাকেন আর আমরা মনে করি আমরা সমাজ-সংসারের কাছে আমাদের কর্ত্তব্য করিতেছি। অবশ্য-ম্ভাবী মৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি। সে যে মালঞ্চের মালা-করের মতো কখন্ আসে তাহারো ঠিক্ নাই। শুনিয়াছি এক পথহারা তারার আকর্ষণে আমাদের সৌরজগতের আরম্ভ। আবার যে আর একদিন আর এক পথহারার আকর্ষণে তাহার শেষ হইবে না, কে বলিতে পারে। আর তাহা যদি নাও হয়, তাহা হইলেও তো এই পৃথিবীর জীবনের একদিন অবসান আছে।

মধ্যযুগের মানুষের মনের কথা তাই বোঝা সহজ ছিল। জীবন যখন একটি অনন্ত জীবনের প্রস্তাবনা তখন তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ছিল তৃপ্তি। সে বিশ্বাস আর নাই। তাই অনেক লেখক সেই অনন্ত জীবনের স্থানে বসাইয়াছেন অনন্ত ভবিষ্যৎ। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে,

সপ্ত সমুদ্র লেমনেডে ভরিয়া যাইবে। ধরিয়া লইলাম হইবে—কিন্তু আমার তাহাতে কী আসে যায়? ততদিন আমার কোনো বংশধর থাকিবে কিনা তাহাও জানি না। সেদিনের জন্য আজ আমি কেন উপবাসী থাকি?

কিন্তু তবু তো সেই ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিয়াই যাই। মানুষের এ আত্ম-প্রবঞ্চনা মর্ম্মগত বস্তু। এ সে অতিক্রম করিতে পারে না। ল্যাটিন নারীও তাই চোখ খুলিয়াই স্বপ্ন দেখে।

আর ভালোবাসা—হয়তো শব্দটি আমি ব্যবহার করিতেছি এক অর্থে, আর তুমি বুঝিতেছ আর এক অর্থে। হৃদয় যখন অন্যকে চায়, তখনো যাহার সহিত সুখে দুঃখে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তুচ্ছ নয়। তাহার বুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিবার অর্থাৎ তাহাকে সকল কথা বলিবার কারণ ল্যাটিন নারী খুঁজিয়া পায় না।

বলিতে পার তবে সে পথে না যাওয়াই ভালো। আমিও বলি তাহাই ভালো। কিন্তু মনের মতো মানুষ পাওয়া যায় কই। মনকেই বরং শেখানো পড়ানো চলে। আর যে সে পথে গিয়াছে সে যে কেন গিয়াছে তাহা ঠিক্ তাহার হৃদয় লইয়া তাহার অবস্থায় না পড়িলে কখনো বুঝিবে না।"

তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সহযাত্রী একবার বাহিরে তাকাইয়া বলিলেন "ফ্রান্সের এক অতি সুন্দর প্রদেশের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি কিন্তু এখানে বেশি লোক আসে না। রিভিয়েরা-ই আজ-কালকার

ফ্যাশান। দিনের গাড়ি হইলে সব দেখিতে পারিতে। এ দেশটি আমি ভালো করিয়া জানি। এইখানেই আমার এক বন্ধুর জীবনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বন্ধুর নাম তোমায় বলিব না। আর বলিলেও তুমি মনে রাখিতে পারিবে না,—কারণ নামটি প্রায় দেড়হাত লম্বা। তাহাকে আমি ডন আন্দ্রে বলিয়া বলিব। সে আমার আশৈশব সহচর। এক সহরে আমাদের জন্ম—গত যুদ্ধের আরম্ভ অবধি আমরা স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে একসঙ্গে জীবন কাটাইয়াছি। কিন্তু কিছুদিন আগে অবধি জানিতাম না যে সে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানীর গুপ্তচর ছিল। কিসের আশায় এ সাংঘাতিক কাজে যোগ দিয়াছিল জানি না। এ কাজে সাফল্য লাভ করা কঠিন। সর্ব্বদা ধরা পড়িবার ভয়, আর ধরা পড়িলে জগতে সাহায্য করিবার জন্য কেহ হাত বাড়াইবে না।

এখান হইতে খুব বেশি দূরে নয় একটি সহরে আন্দ্রে ১৯১৭ সালে জুন মাসে অবস্থিতি করিতেছিল। সেই সহরের নিকটেই ফরাসীদের একটি গোলা-কামানের কারখানা ছিল। সেখান হইতে গোপনীয় খবর কিছু সংগ্রহ করা ছিল উদ্দেশ্য। সে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের মতো ফরাসী ভাষা বলিতে পারিত এবং সেই সময়ে একজন ফরাসী অফিসারের ছদ্মবেশে ঘুরিতেছিল। সব সময়েই কিছু সংখ্যক অফিসার ছুটীতে থাকিত। যে অফিসারের ছদ্মবেশে গুপ্তচর ঘুরিত, তাহার রেজিমেণ্ট-এর বিস্তৃত বিবরণ, যুদ্ধ সম্বন্ধে নির্ভুল খবর—

এসব না জানিলে, একস্থানে বেশিদিন না থাকিলে, এবং এক নামে বেশি দিন না চলিলে ইহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও খুব বেশি ছিল না।

সে সহরটিতে আন্দ্রে সপ্তাহখানেক থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। তিন-চার দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাজ কিছুই হয় নাই।

সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি—আন্দ্রে সান্ধ্যভ্রমণের পর নিজের হোটেলে ফিরিতেছিল। চাঁদের আলোতে তখন ভুবন ভরিয়া গিয়াছে।

রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, গাড়ি-ঘোড়া চলা নিষিদ্ধ। প্রতি জানালায় কালো পর্দ্দা, পথে কোনো বাতি নাই। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে হইলেও এখানে 'এয়ার-রেড্'-এর ভয় ছিল। আন্দ্রে কিন্তু তখন সে কথা ভাবিতে ছিল না। সে রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস ও কৃত্রিম-আলোকহীন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর শোভা তাহার বিপদ-সঙ্কুল জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত যেন মিষ্টতায় ভরিয়া দিতেছিল।

ধীরে ধীরে সহরের যে স্থানে ঘন বসতি, আন্দ্রে সেইখানে আসিয়া পোঁছিল। এইখানের নিস্তব্ধতা তাহার বড় অদ্ভুত লাগিতেছিল। যেন মৃত পৃথিবীর উপর ভরা চাঁদ উদাসীনের হাসি হাসিতেছে। তাহার নিজের পায়ের শব্দেই তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল যেন কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

সহসা যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। কাছেই যেন কে

তোপ ছাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি বাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে রাত্রির সেই শান্ত আকাশ এয়ারোপ্লেনের ইঞ্জিনের ঘর্ঘরে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আন্দ্রে ছুটিতে আরম্ভ করিল। রাস্তা পার হইতেই গিয়া দেখে যে একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। আন্দ্রে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার উপরে কিছু দূরে একটি গির্জ্জা ছিল। দরজা ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। গির্জ্জায় কেহ ছিল না। শুধু এক অন্ধকার কোণে একটি ভার্জ্জিন মূর্ত্তির পায়ের কাছে একটি মাত্র বাতি জ্বলিতেছিল।

নিজের কোলে রমণীটির মাথা রাখিয়া আন্দ্রে তাহাকে একটি বেঞ্চিতে শোয়াইয়া দিল। তখন বাহিরে কী হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া যে শব্দ তাহার কানে আসিতেছিল সে যেন কোনো বিজন সৈকতে তরঙ্গ ভাঙ্গিবার শব্দ।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর কয়েক মিনিটের জন্য সাইকেলের ঘণ্টা ও এম্বুলেন্স্ গাড়ির শব্দে সহর যেন জাগিয়া উঠিল। কিছুকাল পরে তাহাও থামিয়া গেল।

এবার আন্দ্রে রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে কি?"

ক্ষীণ কণ্ঠে রমণী উত্তর করিল, "হাঁ, আমাকে বাহিরে লইয়া চলুন।"

বাহিরে আনামাত্র রমণীটি আন্দ্রের হাত ছাড়িয়া সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। তারপর দুর্ব্বল অথচ স্পষ্ট স্বরে কহিল "আপনি আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন, কিন্তু এবার আমি ফিরিতে পারিব। আপনি আমার জন্য আর দেরি করিবেন না।"

আন্দ্রে আপত্তি করিয়া বলিল "সে কি হয়? এ অবস্থায় কি আমি আপনাকে একাকী যাইতে দিতে পারি? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।"

রমণী উত্তর দিল "না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এবার আমি যাইতে পারিব। কিছু মনে করিবেন না। যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সাহায্য লইবার প্রয়োজন থাকিলে অবশ্য তাঁহার সাহায্য লইতাম।" তারপর আন্দ্রেকে একটি ঠিকানা দিয়া বলিল—"এই ঠিকানায় যদি কাল সকালে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, বিশেষ সুখী হইব।"

এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ করা নিষ্ফল মনে করিয়া আন্দ্রে নিজের পথ ধরিল। মাঝে মাঝে ফিরিয়া দেখিল রমণীটি তখনো সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়। তারপর ভাবিল রমণীটি হয়তো আরো একটু বিশ্রাম করিতে চায়—আর তারপর তাহার নিজেরই তো সহর।

সে দিন ঘুমাইবার আগে আন্দ্রে 'এয়ার রেড্' অপেক্ষা এই অপরিচিতার কথা বেশি ভাবিয়াছিল।

সাজসজ্জায়, কথাবার্ত্তায় তাহাকে ভদ্রকন্যাই মনে হইয়াছিল। যুবতী কিন্তু সুন্দরী নয়। তবু সে রূপের মধ্যে যেন কী একটা আকর্ষণ ছিল। তাহার এই ভবঘুরে জীবনে বহু নারীর সহিত বিভিন্ন রকমের পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন ভাবে আর কেহ তাহার মন আলোড়িত করে নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া আন্দ্রে একবার হাসিয়া উঠিয়া মনে মনে কহিল—"আর কিছু নয়, আমার স্বভাবই হইতেছে রহস্য ভালোবাসা। এই অপরিচিতা যদি আমাকে তাহার সঙ্গে ফিরিতে দিত, তারপর তাহার পিতার সহিত তাহার জীবন-রক্ষক বলিয়া আমার পরিচয় করাইয়া দিত আমি উৎফুল্ল হইয়া ঘরে ফিরিতাম বটে, কিন্তু তাহার কথা আর দ্বিতীয়বার ভাবিতাম না। যাহা করা স্বাভাবিক, তাহা করে নাই বলিয়াই আমি তাহার কথা এত ভাবিতেছি।" ইহার পর তাহার ঘুমাইতে আর বিলম্ব হয় নাই। এবং সে রাত্রিতে যদি কিছু স্বপ্ন সে দেখিয়া থাকে, তবে পরদিন প্রভাতে তাহা তাহার মনে ছিল না।

সে প্রভাতে সে অপরিচিতা যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে দুইটি ঘর লইয়া সে ছিল। সে সহরের মেয়ে সে নয়। বসিবার ঘরে যাহা থাকা উচিত তাহাই ছিল। দেয়ালে ছিল একখানা মাত্র ছবি। কোনো ফরাসী গ্রামের। গ্রামের পাশ দিয়া একটি খাল চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার দুই কূলে দীর্ঘ পপ্‌লারের শ্রেণী।

এবার দিনের আলোতে আন্দ্রে রমণীকে দেখিল। মুখখানা অনেকটা চৌকোণ, নাকটি ঈষৎ স্থূল, ঘন জোড়া ভ্রূর নীচে ছোট দুইটি চোখ, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ এবং একরাশ সোনালী চুল। যুবতীকে খর্ব্বাকৃতিই বলিতে হইবে, কিন্তু নিটোল সুঠাম গঠন। কী দেহে, কী-সজ্জায়, কী কথাবার্ত্তায় কোথাও তাহার কিছু শিথিলতা ছিল না। নাম মাদেলিন উরেল। বিশেষ কাজে এই সহরে প্রায় একমাস আছে।

এ ক্ষেত্রে আলাপ যেরূপ হইতে হয়, তাহাই হইল। তবে আন্দ্রে যখন বলিতেছিল যে সে বিশেষ কিছুই করে নাই, মাদেলিন যখন আহত হয় নাই তখন একটু পরে বিনা সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতে পারিত তখন বাধা দিয়া মাদেলিন কহিল "সে কথা ঠিক নয়। আমি সে স্থানে আবার গিয়াছিলাম। যেখানে আমি পড়িয়া যাই, তাহার প্রায় দশ হাত দূরে পরে একটি বোমা পড়িয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে না সরাইয়া লইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।"

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে আন্দ্রে অনুভব করিতেছিল যে আগের রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে অনুভূত সেই আকর্ষণ আজ কী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে চোখে পড়ে রমণীর সুন্দর হাত দুটি। গ্রাম-ছাড়া পথের মতো যেন কোন অচিনপুরীর ইঙ্গিতে ভরা।

উঠিবার আগে আন্দ্রে মাদেলিনকে তাহার হোটেলে

সেই দিন সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিল। রমণী ধন্যবাদ সহকারে সম্মতি জানাইল।

জীবনের কোনো অবস্থাতেই আন্দ্রে নিজের কাজ ভোলে নাই। তাহার এই অভিনব চাঞ্চল্য ভরা মন লইয়াও সে সারাদিন নিজের কাজ করিল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নামিতে তাহার একটু দেরি হইল। কিন্তু মাদেলিন তখনো আসে নাই।

যুদ্ধের সময়ে কোনো হোটেলেই বিশেষ খাওয়া জুটিত না। খাইতে পাইত শুধু সৈন্যেরাই। তবু যাহা সব চেয়ে বেশি দাম দিয়া পাওয়া যায়, আন্দ্রে তাহারই আয়োজন করিয়াছিল। সান্ধ্য ভোজনের কিছু পর যখন মাদেলিনের ফিরিবার সময় হইল, তখন আন্দ্রে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাদেলিন কোনো আপত্তি করিল না।

এই পরিচয়ের এই সমাপ্তি আন্দ্রে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। অথচ এই ভদ্রকন্যার সমস্ত ব্যবহারই সুরুচি-সঙ্গত ও সুশোভন, কোনো প্রগল্‌ভতার অবসর সে আন্দ্রেকে দেয় নাই। এ পরিচয় রাখিবার বা ইহাকে অন্তরঙ্গতায় পরিণত করিবার কোনো উপায় আন্দ্রে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মাদেলিনের সহিত কথা বলিতে বলিতে ও এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে বোর্ডিং হাউসে উপনীত হইল।

মাদেলিনের নিকট চাবি ছিল। দরজা খুলিয়া আন্দ্রের

দিকে মুখ ফিরাইতে আন্দ্রে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি উপরে আসিতে পারি কি ?"

মাদেলিন দ্বিধা করিল না, স্নিগ্ধ-স্বরে কহিল "এস।"

প্রেমাস্পদের মুখে প্রথম 'তুমি'-সম্বোধন যে কী মধুর, একদিন তুমি তাহা বুঝিবে। ছেলে বেলায় অনেকে চাঁদের দিকে চাহিয়া মনে করে কতগুলি মই জোড়া দিলে চাঁদে পৌঁছানো যায়। আর আজ যেন সেই আকাশের চাঁদ নামিয়া আসিয়া আন্দ্রের কাছে ধরা দিল।

মাদেলিন ভালোবাসিতে জানিত। যে ভাবে প্রেম-মুগ্ধা পত্নী স্বামীর কাছে ধরা দেয়, সেই ভাবে, স্নেহে, মোহে এবং করুণায় মাদেলিন আন্দ্রের কাছে ধরা দিল। তাহার মধ্যে কোনো স্থূলতা, কোনো কদর্য্যতা ছিল না।

খানিক পরে যখন তাহারা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। এবার আন্দ্রের বিদায় লইবার পালা। মাদেলিনের হাত দুটি নিজের হাতে লইয়া বলিল "এখন আমার যাইবার সময়। তোমাকে কোনোদিন ভুলিব না। আমাকে তুমি মনে রাখিবে এ আশা আমি করি না। তবে যদি কোনোদিন স্মরণ-পথে আসি তখন মনে যাহাতে ঘৃণা না আসে, সেই চেষ্টা করিয়ো।"

মাদেলিন যেন অন্যমনস্ক ছিল। আন্দ্রের কথা শেষ হইতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "তোমারই তো ভুলিবার কথা। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় তো তোমার

জীবনের একটি ছোট অধ্যায় মাত্র, কিন্তু আমি আমার জীবন-রক্ষককে কী করিয়া ভুলিব ?”

আন্দ্রে কহিল “মাদেলিন—যদি সত্যই আমি তোমার জীবন-রক্ষা করিয়া থাকি, তবে সেইজন্যই তুমি আমাকে ভুলিবে এবং আমি তোমাকে ভুলিব না। যাহাতে সহজে ভুলিতে পার, সেই জন্যই তুমি আমাকে আজ স্বর্গের অধীশ্বর করিয়াছ। আমার চেয়ে বেশি কেহ জানে না আমি উহার কত অযোগ্য। কিন্তু উপকারের মতো দুঃসহ বোঝা আর কিছু নাই। তার শোধ দিতে না পারিলে বা আর কোনো উপায়ে সেটি ভুলিতে না পারিলে মানুষ ছট্‌ফট্‌ করে। আর উপকার যে করে সে ঋণটি চিরস্থায়ী করিতে চায়। তাহা যদি নাও পারে, তবে স্বহস্তরোপিত তরুর প্রতি মানুষের যে স্নেহ হয়, সেই শ্রেণীর একটি স্নেহ উপকৃতের প্রতি তাহার চিরদিন থাকে।”

এবার উঠিয়া গিয়া মাদেলিন ঘরের অন্য বাতিগুলি জ্বালাইল। তারপর আন্দ্রের কাছে আসিল ; কিন্তু না বসিয়াই কহিল “আমার মনে হয় তুমি সেই শ্রেণীর লোক যারা পূর্ণিমা রাত্রিতে শুধু চাঁদের বিপরীত দিকটার কথাই ভাবে। সে দিকটা আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্ব্বদা না ভাবিলেই নয় ?”

আন্দ্রে উত্তর দিল “কিন্তু আলোক ভরা দিকটিও তো অখণ্ড সত্য নয়।”

“তাই বলিয়া সেটি ভোলাও তো উচিত নয়। আমার কী

মনে হয় জান? তুমি শৈশবে মাতৃহীন, কোনো আত্মীয়ার কাছে মানুষ হইয়াছ। সে তাহার খুসী অনুসারে তোমাকে ভালোবাসিয়াছে, কখনো স্থায়ী স্নেহ পাও নাই। তোমার ভাইবোন ছিল না, ত্যাগের তৃপ্তি কখনো জান নাই। কৈশোরে তোমার বেশি সহচর ছিল না। কোনোদিনই তুমি খেলাধুলা বেশি কর নাই। খোলা আকাশকে ভালোবাস নাই। চিরদিন নিজের হৃদয়কে লইয়া কোনো ঘরের কোণে দিন কাটাইয়াছ। বহুদিন অবধি নিরাশ হইবার ভয়ে কিছু আশা কর নাই, কিছু চাহিতে পার নাই। তারপর শুধু কাড়িয়া লইয়াছ, কাহারো দানের অপেক্ষা করিতে শেখ নাই। তোমাকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় খুব প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শুধু হাসির জোগান দাও, তোমার মন হাসিতে শেখে নাই।"

এবার উঠিয়া গিয়া আন্দ্রে মাদেলিনকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাদেলিন ধরা দিল না। মুগ্ধ কণ্ঠে আন্দ্রে কহিল—"জানিতাম তুমি মায়াবিনী, তবুও এত খবর তুমি কী করিয়া জানিলে? ইহার প্রত্যেক কথাটি সত্য। হয়তো আমারি দোষ, কিন্তু জীবনে স্থিরভূমি আমি পাই নাই। স্রোতের শৈবালের মতো ভাসিয়া চলিতেছি। কোথায় চলি, কিসের আশায় চলি, তাহাও অনেক সময় ভাবিয়া পাই না।"

এবার যেন সুপ্ত ফণিনী জাগিয়া উঠিল। মাদেলিনের এ কণ্ঠস্বর আন্দ্রের পরিচিত নয়। মাদেলিন বলিতেছিল—

"কিসের আশায় ফ্রান্সের এ শত্রুতা সাধন করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতে পারিয়াছ? তোমার কাছে আমার দেশ কী অপরাধ করিয়াছে বলিবে কি? তোমাদের জাতি আমাদের মিত্রশক্তি। বলিবে কি কোন প্রলোভনে, কোন স্থির ভূমির আশায়, এ ঘৃণিত ব্যবসায় ধরিয়াছ?"

আগের রাত্রিতে যখন পায়ের কাছে বোমা ফাটিয়াছিল তখনো আন্দ্রে এত চমকিত হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার দিশেহারা হইলে চলিবে না, তাই উত্তর দিল—

"ফ্রান্সের শত্রু আমি, মাদেলিন?"

এবার মাদেলিন সহজ সুরে কহিল—"আর প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়ো না। ব্যবসায় তোমারও যাহা, আমারও তাই, শুধু পার্থক্য এই যে আমি এ কাজ দেশের জন্য করিতেছি।

তোমার সকল খবর কাল আমার কাছে পৌঁছায়। যে নামে তুমি চলাফেরা করিতেছ, তাহাও তাহাতে লেখা ছিল। তুমি এই অঞ্চলেই আছ, তাহাও আমরা জানিতাম, তবে ঠিক কোথায় আছ সে খবর আমাদের ছিল না। সে সব কাগজ-পত্র আমার হাতে ব্যাগের মধ্যে ছিল। গির্জ্জায় যখন আমার ভালো করিয়া জ্ঞান হয় তখন জানিতে পারি যে ব্যাগ আমার কাছে নাই। সেই স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য একলা ফিরিতে চাই। কিন্তু তোমার সম্মুখে করিব না বলিয়া তুমি অদৃশ্য না হইলে গির্জ্জার সিঁড়ি হইতে আমি উঠি নাই। ফিরিয়া গিয়া সে ব্যাগ আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি।

তখনো জানিতাম না তুমি এই লোক কি না। তোমাকে যে আসিতে বলিয়াছিলাম সে সত্যই আমার রুক্ষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু তোমার নাম ও রেজিমেণ্ট যখন বলিলে, তখন আমার আর সন্দেহ রহিল না। শুনিলে বিস্মিত হইবে যে ঐ নামের অফিসারটি আজ এক সপ্তাহ হইল নিহত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, তুমি ঘৃণার পাত্র নও, তুমি দয়ার পাত্র।”

অন্য সময়ে হয়তো আন্দ্রে নিজেকে বাঁচাইবার আরো চেষ্টা করিত। কিন্তু ম্যাদেলিনকে দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইয়াছিল যে সে মন একেবারে ঠিক না করিয়া কোনো কাজ করে না। তাই শুধু জিজ্ঞাসা করিল—

“তুমি এখন কী করিতে চাও ?”

তেমনি সহজ সুরে মাদেলিন উত্তর দিল “তোমাকে ডাকিয়া আমি ধরাইয়া দিতে চাহি না। সন্ধ্যাবেলায় তোমার হোটেলে যাইবার সময়ে দেখিয়াছি যে খুব আস্তে গেলেও এখান হইতে সেখানে পৌঁছিতে পনেরো মিনিট লাগে। যদি কোনো কারণে দেরি হয়, সেই জন্য আরো পনেরো মিনিট আমি অপেক্ষা করিব। তুমি এস্থান ছাড়িবার ঠিক আধঘণ্টা পরে মিলিটারী পুলিশ তোমার খবর পাইবে—তারপর তোমার অদৃষ্ট।”

আন্দ্রে কোনো উত্তর দিল না। শুধু মাদেলিনের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাদেলিন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল না। এবং কহিল “আমাকে অযথা নিষ্ঠুর মনে করিয়ো না।

তোমার নিকট আমার যাহা ঋণ তাহা আমার শোধ দিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার এ ধূলি-ধূসরিত দেহের আজ কোনো মূল্য নাই। তবু তোমাকে যাহা আজ আমি দিয়াছি, এ জীবনে আর কাহাকেও তাহা দিতে পারি নাই। দিতে চাহিয়াছিলাম একজনকে—সে গ্রহণ করে নাই।

তাহারি সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক ছিল।—যুদ্ধ বাধিতেই এবং তাহার ডাক না পড়িতেই সে যুদ্ধে যোগ দেয়। যে রাত্রিতে চলিয়া যায়, সেই সন্ধ্যায় আমি তাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলাম। সে কোনো দিনই বেশি কথা কহিতে জানিত না। শুধু বলিয়াছিল 'মাদেলিন পারিতাম, যদি তোমাকে আর একটু কম ভালোবাসিতাম। ভয় করিয়ো না, আমি ফিরিয়া আসিব।' কিন্তু সে আর ফেরে নাই। ঐ যে ছবি দেখিতেছ উহা আমাদের গ্রামের ছবি। উহার একটি গাছও আজ নাই। ঐ গ্রামের প্রত্যেক ধূলিকণাটি ফরাসী রক্তে রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে। আমার দুই ভাই ছিল—একজন মরিয়াছে, আর একজনের দুই চোখ গিয়াছে। আমার প্রৌঢ় পিতা চুলে কলপ লাগাইয়া, বয়স কম দিয়া যুদ্ধে যোগ দেন। তিনিও আর ফেরেন নাই। শুধু সান্ত্বনা এই যে যুদ্ধের এক বৎসর আগেই আমার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন।

এখন হয়তো বুঝিবে ফ্রান্সের কোনো শত্রুকে আমি কেন ছাড়িয়া দিতে পারি না। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই শত্রুই আমার জীবন-রক্ষক। সে জীবন আমি তোমাকে

ফিরাইয়া দিতেছি। যদি বিনা শব্দে আমাকে হত্যা করিয়া যাইতে পার, যাও। কিন্তু আর কিছু করিবার চেষ্টা করিয়ো না। এই বাড়িতেই মিলিটারী পুলিশের লোক আছে এবং এই ঘর না ছাড়িয়াই আমি তাহাকে যে কোনো মুহূর্তে ডাকিতে পারি। কিন্তু নিশ্চিত জানিয়ো যে যে জীবন এই দেশ আমাকে দিয়াছিল সেই জীবন লইয়া আমি বাঁচিয়া রহিব, আর সেই দেশের মহাশত্রু তুমি, তুমি মুক্তি পাইবে সেই জীবন রক্ষা করিয়াছ বলিয়া, এ অসম্ভব।”

মাদেলিন থামিল। তাহার কথায়, চোখে মুখে কোনো উত্তেজনা ছিল না। যে পথ সে ধরিয়াছে সেই যেন তাহার একমাত্র পথ। তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই।

এবার আন্দ্রে কথা বলিল। কহিল “তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে, দিবে কি ?”

মাদেলিন ভ্রূ তুলিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল “কী ?”

আন্দ্রে বলিল—“তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিব এত শক্তি আমার নাই, আর তাহা আমি করিতেও চাই না। এ কাজে কী বিপদ তাহা জানিয়া শুনিয়াই যখন এ কাজে হাত দিয়াছি, তখন আজ আমার আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কাল দ্বিপ্রহরের আগে হয়তো যাহার জীবনের অবসান হইবে, তোমার কাছে তাহার মিথ্যা কথা বলিবার কিছু কারণ নাই। তোমাকে আমি ভালোবাসিয়াছি। বহু দিন বহু নারীর কাছে এ কথা বলিয়াছি কিন্তু তখনো জানি নাই ভালোবাসা কী !

পৃথিবীতে আমার এই শেষ রাত্রিতে আমার সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাখিতে দাও। কাল ভোরে তোমাদের বাড়ি ছাড়িলেই তুমি তোমাদের কর্ত্তৃপক্ষকে খবর দিয়ো।”

মাদেলিন ততক্ষণ মেজেতে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়াছে! আন্দ্রে দেখিল সে অন্যদিকে চাহিয়া আছে এবং তাহার চোখের কোণে দু’বিন্দু অশ্রু। আন্দ্রের কথার উত্তরে মাদেলিন কিছু বলিল না। মেজে হইতেই হাত দিয়া আন্দ্রেকে নিজের কাছে টানিয়া লইল।

প্রত্যাসন্ন মৃত্যু আন্দ্রের রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। আগে কখনো সে জানে নাই সুখের মর্ম্মস্থলে এত বেদনা। এক একবার মনে হইতেছিল আর তাহার নূতন করিয়া মরিতে হইবে না। সে মরিয়াছে, মাদেলিন মরিয়াছে। তাহাদের নিবিড়তম আলিঙ্গন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই মতো রক্ত-মাংসে গড়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভরা, ও সুখেদুঃখে মানুষ একটি নারীর মধ্যে এ অনন্ত বিস্ময় থাকিতে পারে। সে বিস্ময়ের গোপন উৎস যেন তাহারই স্পর্শ অপেক্ষা করিয়া আছে এবং সেখানেই পৌঁছিতে পারিলে যেন সে বুঝিতে পারিবে সৃষ্টির প্রহেলিকা, নরনারীর আকর্ষণ, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ও দেহমনের একাত্মতা। সেই ইশারাই ছিল বুঝি প্রভাতের তরুণ আলোয় দেখা মাদেলিনের যৌবন-কোমল বাহুদুটিতে। সেই বাহুর আহ্বান তাহাকে আনিয়াছিল এই মৃত্যুর অভিসারে এবং নিয়া চলিয়াছে মাদেলিনের অন্তরের অন্তরে যেখানে মণিময়

মঞ্জুষায় রহিয়াছে সেই গোপন কথাটি যাহা যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষ খুঁজিয়াছে কাব্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে।

ঘরের বাতি তখনো জ্বলিতেছিল। নীল-সবুজ আলো। যেন সমুদ্রগর্ভে কোনো মৎস্যকন্যার বিলাস-কক্ষ। আন্দ্রে দেখিল শ্রান্তি-নিমীলিত-নয়না মাদেলিনের একটি হাত তাহারই কণ্ঠলগ্ন। তাহারই দেহের উপর দুলিতেছিল মাদেলিনের নিশ্বাস-চঞ্চল বক্ষ—যেন তালে তালে উঠিতেছিল আরম্ভ-অবসানের, বাসনা ও বিরাগের এক অশ্রুত সঙ্গীত।

সহসা আন্দ্রের দৃষ্টি সোফাটির উপর পড়িল। হোটেল হইতে ফিরিয়া মাদেলিন এইখানেই তার টুপিটি খুলিয়া রাখিয়াছিল। টুপির কাছেই ছিল একটি হ্যাট্‌-পিন। তাহার পর যাহা ঘটিল, একটু আগেও আন্দ্রে তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই। হাত বাড়াইয়া সে হ্যাট্‌-পিনটি লইল। মাদেলিনকে একটু দূরে সরাইয়া সে তাহার বক্ষে একটি গভীর চুম্বন করিল এবং মুখ উঠাইয়া সেই চুম্বন-সিক্ত অংশের কাছে হ্যাট্‌-পিনটি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

তখনো যেন আন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গে নাই কিন্তু এবার সে সত্যই জাগিল। মনে করিল মাদেলিন বুঝি তখনই চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু সে একটু অস্ফুট শব্দ করিল মাত্র। তারপর চোখ না মেলিয়াই অতি মৃদুস্বরে কহিল “বাতি নিবাইয়া দিয়া একটি জানালা খুলিয়া দাও।”

আন্দ্রে তাহাই করিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে মাদেলিন

কহিল "কাছে এস, আস্তে [illegible]সিও, নীচের লোক যেন না জাগে।"

আন্দ্রে কাছে আসিল। মাদেলিন এবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল "কী করিয়া জানাইব আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ।"

তারপর কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। অকস্মাৎ মাদেলিন কহিল "O, the air of France."

মাদেলিনের সেই শেষ কথা। আন্দ্রে উঠিয়া গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া আবার বাতি জ্বালাইল। দেখিল মাদে-লিনের বক্ষ হইতে একটি ক্ষীণ রক্ত-ধারা কার্পেটে নামিয়াছে, গণ্ডের আরক্ত আভা মিলাইয়া গিয়াছে, দেহ শীতল।

অনেক ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য আন্দ্রেকে দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারই রচিত এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সংযত না রাখিলে সে তখনই পাগল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। কী ছিল কয়েক মিনিট আগে ঐ দেহের মধ্যে—কোন যাদুমন্ত্রে ফুটিয়াছিল ঐ দেহে রূপ আর তাহার দেহে ক্ষুধা। ঐ অসাড় বাহুদুটি কিছুক্ষণ আগে তাহাকে কী নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া-ছিল, কখনো লতার মতো কোমল, কখনো নাগপাশের মতো কঠিন। কিন্তু এত ভঙ্গুর—একটি হ্যাট্-পিনের স্পর্শ আর সব ফুরাইয়া গেল!

মাদেলিনের বিস্রস্ত কেশরাশি হইতে তখনো সৌরভ আসিতেছিল, আর তাহার সহিত মিশিতেছিল রক্তের তীব্র

গন্ধ। আর সহ্য করিতে না পারিয়া আন্দ্রে বাতি নিবাইয়া দিয়া মাদেলিনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্থির হইয়া তাহার অনেক বিষয় ভাবা প্রয়োজন। ভোরের আগে তাহার এ বাড়ি ছাড়া অসম্ভব। যদি নিঃশব্দে বাহিরে যাইতেও পারে, তবে ঘরের দরজা খোলা রহিবে। যদি কোনো পরিচারিকা বা আর কেহ এ ঘরে ভোরের আগেই প্রবেশ করে। এ দিকে ভোরের আগে কোনো ট্রেনও নাই। সুতরাং হোটেলেও তাহার ফেরা অসম্ভব।

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইতেছিল এ হত্যায় সে নিমিত্তমাত্র। ইহা মাদেলিনেরই কোনো অলৌকিক শক্তিতে ঘটিত হইয়াছে। দেশের মহাশত্রুর কাছে সে ঋণী থাকিতে চাহে নাই। তাহাকে ধরাইয়া দিতেও তাহার মন সরে নাই। সুতরাং তাহারি রক্ষিত জীবন তাহারই হাতে শেষ করাইয়াছে। নতুবা হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে অবধি এ কল্পনা তো তাহার মনে আসে নাই।

হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া আন্দ্রে যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে মানুষের এত আতঙ্ক হইতে পারে, আন্দ্রে কখনো ভাবিতে পারে নাই। অথচ শব্দটি ঘরের কোণে একটি তিপয়ের উপরে রাখা ঘড়ির ছাড়া আর কিছুই নয়। টিক্ টিক্ টিক্—তার স্নায়ুজালে যেন ছুরির মতো ঐ শব্দ বিঁধিতেছিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া গিয়া কোনো রকমে ঘড়িটি বন্ধ করিয়া আসে। টিক্ টিক্ টিক্—ও শব্দ-ধারা

যেন মাদেলিনের বুকের রক্তধারার মতো,প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে নিকটতর করিতেছে। ততদিনই আন্দ্রে শুধু বাঁচিয়াছিল যতদিন সে ছিল শুধু বিধাতার মনের স্বপ্ন। জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতেই তো মৃত্যুর পথ-যাত্রা। এ স্রোতে কি উজান বহে না ?

তাহার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন—কিন্তু শক্তি কোথায়। আন্দ্রে মনে মনে কহিল "আমার পাগল হইবার দেরি নাই। গুপ্তচর আমি, ধরা পড়িতেছিলাম, হত্যা করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি, আর মনের দুর্ব্বলতায় নানারূপ উদ্ভট কল্পনা করিতেছি।"

এই চিন্তার ধারা তাহার মনে কিছু স্বস্তি আনিয়া দিল। মাদেলিনের প্রসাধনের টেবিলের উপরে একখানা বই পড়িয়াছিল। আন্দ্রে উঠাইয়া দেখিল বইখানি লা ব্রুইয়ের-এর রচনা হইতে একটি সঙ্কলন। একটি পাতার কোণ ভাঁজ করা রহিয়াছে। বইখানি খুলিতেই সেই পাতাটি চোখে পড়িল। লা ব্রুইয়ের বলিতেছেন "জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার ধন হয় মেলে না, না হয় যখন বা যে অবস্থায় মেলে তখন আর তাহার সুখ দিবার শক্তি নাই।"

এতক্ষণ পরে একটি গভীর বিষাদে আন্দ্রের মন ভরিয়া গেল। কী ছিল এ মেয়েটির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ধন,—কে জানে কী ছিল তাহার নিশীথের স্বপ্ন। কী সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল সে এই কয়টি ছত্রে ?

তাহাকে বেশিক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই

গির্জ্জায় 'এঞ্জেলাস'-এর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আন্দ্রেও বাহির হইয়া ষ্টেশনের পথ ধরিল।"

ইহার পর 'রেস্তোঁরা-কার্'-এ আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু আমার সহযাত্রী আর বেশি কথা বলেন নাই। তাঁহার কথার আতসবাজি যেন পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। ছ্‌একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া 'হুঁা' 'না' উত্তর পাইয়া বাহিরে চাহিয়াছিলাম। সে দিন রাত্রিতে চাঁদ ছিল না, কিন্তু তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। আর মনে হইতেছিল যেন তাহারা অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ বন্ধু কহিলেন—

"কী সুন্দর তারা-ভরা আকাশ, নয় কি? ট্রেনে যাইতে যাইতে, বা কোনো হোটেলে থাকিবার সময় অনেক দিন আমার মনে হইয়াছে, আমরাও প্রত্যেকে ঐ তারার মতো। মনে হয় যেন উহারা পরস্পর কত কাছে কাছে। কিন্তু শোনা যায় একটি হইতে আর একটি লক্ষ যোজন দূরে। কিন্তু তবু কি জানো, সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে এই ক্ষণিকের সহযাত্রীরাই মানুষের সত্যকার দরদী। আর দেখা হইবে না বলিয়াই তাহাদের কাছে অনেক কথা বলা যায়।"

কী একটি সন্দেহ অগোচরে আমার মনের মধ্যে আসিতে-ছিল, এতক্ষণে তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ঠিক মনে হইতে লাগিল যে আমার সহযাত্রীই সেই আন্দ্রে, অন্য লোকের নাম করিয়া নিজের কাহিনীই বলিয়াছেন।

পরখ্ করিবার অবসর পাইলাম না। সহযাত্রী তখন

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কহিলেন "ইহার পরের ষ্টেশনে এ গাড়িখানা খুলিয়া রাখিবে। ইতালীতে প্রবেশ করিলে নূতন 'রেস্তোরাঁ-কার' এ ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিবে। তোমার পাসপোর্ট, ট্রাঙ্কের চাবি ও টিকিট কণ্ডাক্টার-এর কাছে দিয়া রাখিয়ো,তাহা হইলে ফ্রান্স ছাড়িবার সময় আর উঠিতে হইবে না। এবার বিদায়, বন্ধু, জীবনে যত সুখ-সৌভাগ্য, তোমার হউক।"

চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি আবার সেই কৌতুকোজ্জ্বলতা ফিরাইয়া পাইয়াছে।

নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম।

ক্লান্ত ছিলাম, ঘুম আসিতে দেরি হইল না। কিন্তু সে ঘুম তেমন গভীর নয়। রাত্রিতে একবার মনে হইল যেন আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছি। ছেলেবেলার একখানা বইয়ে সূর্য্যের দূরত্ব বোঝাইবার জন্য এক একস্‌প্রেস্ ট্রেনের কথা ছিল। মনে হইল এ সেই ট্রেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিবে। আমি ফুরাইব, আমার সাথীরা ফুরাইবে, কিন্তু ট্রেন চলিবে, নূতন যাত্রী আসিবে। সেই ট্রেনে রহিয়াছি এই মনে করিয়া এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গেল।

সারথি

স্বষ্টিধর মাঝির তিন পুরুষের খবর জানা যায়। তাহাদের কাহারো জীবন নিজগৃহে রোগশয্যায় শেষ হয় নাই। প্রপিতামহ উমানাথের মৃত্যু হইয়াছিল পদ্মার বুকে জলদস্যুর হাতে, পিতামহ দশরথের মেঘনায় নৌকাডুবিতে এবং পিতা অভয়চরণের নিজ নৌকায় সর্পদংশনে। স্বষ্টিধরও প্রায় চল্লিশ বৎসর অবধি মাঝির কাজ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার শরীর ভাঙিয়া গেল ম্যালেরিয়ায়, সে ব্যবসায় ছাড়িয়া সঞ্চিত কিছু অর্থ লইয়া মহাজনী করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই তাহার মনে বিশেষ সুখ ছিল না। এখনকার লোকে নৌকায় যাতায়াতের সুখ বোঝে না। তাহারা ষ্টীমারেই হৌক বা ডাক বা গহনার নৌকায় হৌক—তাড়াতাড়িতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিলেই সুখী। পৌঁছানোটাই যেন সব, আর যাওয়াটা কিছু নয়। কোথায় গেল সেই আগের কালের যাত্রী সব। তাহারা মাঝিকে চাকরের মতো দেখিত না। দ্বিপ্রহরে কোনো বাজারের কাছে গাছের ছায়ায় নৌকা লাগাইত। যাত্রীদের কর্তা বাজার করিয়া আনিতেন। মাঝিদের খাবারও তাহার সঙ্গে আসিত। তারপর সেই গাছের ছায়ায় রান্নাবান্না হইত। গ্রামের লোক আলাপ করিতে আসিত। অপরাহ্নে কিছুক্ষণ

বিশ্রামের পর আবার নৌকা চলিত। এমনি করিয়া আজকালকার তিন দণ্ডের পথে সারাদিন কাটাইয়া যাত্রা শেষ হইলে কর্ত্তারা খুসী হইয়া যাহা দিতেন, মাঝিদের তাহাতে কখনো অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। এখন আর সেদিন নাই। নৌকাভাড়া কড়ায় গণ্ডায় ঠিক করিয়া তবে যাত্রী নৌকাতে পা দেয়। চুক্তি অনুযায়ী সময়ের মধ্যে না পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আবার তাহা হইতে কাটা যায়। যাত্রীদের যাহা ব্যবহার, আগের কালের লোকে চাকরের সহিতও সেরূপ করিত না। তখনকার কালে পাল তুলিয়া বসিলে কর্ত্তাদের সহিত সুখদুঃখের, দেশবিদেশের গল্প হইত, কোনো মাঝি পাঁচালি পড়িত, কেহ বা গান করিত—কিন্তু সেদিন আর নাই। সুতরাং ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই সৃষ্টিধরের ব্যবসায়ে আর মন ছিল না; কিন্তু তবু যখন বর্ষায় তাহাদের গ্রামের নাগর নদী দুকূল ছাপাইয়া শীতলাতলা অবধি আসিত, যখন বাতাসে আসিত নূতন ধান ও পাটের গন্ধ, তখন একটা অনির্দ্দিষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টিধরের মেজাজ খারাপ করিয়া দিত। রাত্রিতে ভালো ঘুম হইত না। সৃষ্টিধরের স্ত্রী ইচ্ছাময়ী ভয়ে ভয়ে থাকিত; এবং প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত যে বর্ষায় তাহার কর্ত্তার শরীর একেবারেই ভালো থাকে না।

সৃষ্টিধর বুঝিয়াছিল দিনকাল বদলাইয়াছে। তাই তাহার একমাত্র পুত্র শঙ্করকে লেখাপড়া শিখাইবে ঠিক করিয়াছিল। শঙ্করের পাঠশালার পড়া হইয়া গেলে সৃষ্টিধর একদিন বড়

ইস্কুলের হেডমাষ্টারের সহিত দেখা করিতে গেল। হেড-মাষ্টার তখন লাইব্রেরিতে ছাত্রদের আবেদন-পত্র দেখিতে-ছিলেন। তাঁহাকে প্রগাঢ় এক প্রণাম করিয়া সৃষ্টিধর নিজের আবেদনটি জানাইল। কিন্তু কথা তাহার যেন আর ফুরায় না। তাহার আবেদনটি যেন সৃষ্টিছাড়া এবং তাহার জন্য যেন প্রভূত কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন—একবার কহিল সে নিজে চোখ থাকিতেও অন্ধ, তাই তাহার ইচ্ছা তাহার ছেলেটির সেরূপ না হয়। তারপর অন্য কথা পাড়িয়া আবার কহিল যে তাহার ছেলে বাবুদের ছেলের মতো চাকুরি করিবে এ আশা সে করে না। কিছুদিন পড়িলেই সৃষ্টিধর গ্রামের বাজারে তাহার জন্য একটি দোকান করিয়া দিবে।

হেডমাষ্টার ব্যস্ত লোক, এত কথা শুনিবার তাঁহার অবসর ছিল না। এতক্ষণ নিজের কাজে ছিলেন বলিয়া বাধা দেন নাই। এবার তাঁহার হাতের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় অধৈর্য্যের সুরে কহিলেন, "সে আর এমন কথা কী সৃষ্টিধর, পাঠশালার পণ্ডিতের নিকট থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে একদিন এস। ভর্ত্তি হবার ফি দুটাকা, মাসিক বেতন আট আনা, পরে আরো বেশি দিতে হবে।"

সৃষ্টিধরের জীবনে সে একটা দিন। মাঝিপাড়ার কোনো ছেলে এতদিন বড় স্কুলে যায় নাই। সেই স্কুলে বাবুদের ছেলেদের সহিত শঙ্কর এক সঙ্গে পড়িবে এই চিন্তা যুগপৎ তাহার মনে হর্ষ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। জেলার সহরে

গিয়া সৃষ্টিধর শঙ্করের জন্য নূতন কাপড় চোপড় কিনিয়া আনিল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক প্রতিবেশী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, আষাঢ় মাসে কোট গায়ে দিয়া ও শাল চড়াইয়া শঙ্কর পিতার সহিত স্কুলে যাত্রা করিল। স্নানের সময় ছুএকজন বর্ষীয়সী ইচ্ছাময়ীকে বলিল, "শঙ্করকে তো লেখাপড়া শিখাতে পাঠালে, কিন্তু ওকি আমাদের সইবে ?" ইচ্ছাময়ী মনে করিল ওটা হিংসার কথা, উত্তর দিল না।

২

ক্লাসের ছেলেদের চাপাহাসির যেন আর অন্ত নাই। গরমের সময়ে এই অপূর্ব্ব বেশ পরিহিত নিম্নজাতির ছাত্রটি তাহাদের কাছে যেন একটি অদ্ভুত জীব। এ উহার মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। ক্লাসময় একটা ফিস্‌ফাস্‌ চলিয়াছে। অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না। শঙ্কর দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে তাহার সহপাঠীদের চেয়ে তাহার গায়ের জোর অনেক বেশি। কিন্তু মারামারি বাধাইবার জন্য তো একটা অছিলা চাই। তাহার বেঞ্চিতে যাহারা বসিত তাহাদের মধ্যে ছুএকজন পকেটে করিয়া জামরুল আনিত। খাইবার সময় শঙ্করকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিত। কিন্তু সে না দাঁড়াইলে তাহারা নিজেরাই উঠিয়া খাইত। স্কুলে জল খাইবার একটি ঘর ছিল। অন্য ছেলেরা ভিতরে

গিয়া গ্লাসে করিয়া জল খাইত। শঙ্কর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত, দপ্তরী জল ঢালিয়া দিত, সে হাত জোড় করিয়া জল ধরিয়া খাইত। কিন্তু ইহা লইয়াও বিবাদ চলে না। তাহার কাপড় চোপড় দেখিয়া কোনো ছাত্র অপর ছাত্রকে বলিত 'বড় শীতরে ভাই, নয় কি?' কিন্তু সে কথাও তাহাদের নিজেদের মধ্যে। নালিশ করিতেও যেমন তাহার লজ্জা করিত, নিজ হইতে বিবাদ বাধাইতেও তাহার মন তেমনি সঙ্কুচিত হইত। পাঠশালায় সকাল-বিকাল স্কুল হইত, অন্যান্য নিম্নজাতির ছেলে ছিল। এত গোলমাল ছিল না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছাময়ীর কাছে সে বলিত স্কুলে তাহাকে কী সহিতে হয়। ইচ্ছাময়ী প্রবোধ দিয়া কহিত, "ছোট বড় করা ভগবানের হাত, অদৃষ্ট নিয়ে কি ঝগড়া করা চলে। এ জন্মে ভালো হয়ে থাকলে আর এক জন্মে আমরাও বড় হব।" এই পরজন্মের আশ্বাসে শঙ্করের মন কখনো ভোলে নাই। কিন্তু মাকে সে ভালোবাসিত এবং মায়ের নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে স্কুলে কখনো ঝগড়াঝাঁটি বা মারা-মারি বাধাইবে না।

কিন্তু সুখও ছিল। বই লইয়া দশটার সময়ে যখন সে স্কুলে যাইত, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিত—চোখে তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। বয়স্কেরাও তাহার সহিত সম্মানের ব্যবহার করিত। মেয়ে মহলে তাহার আদরের অন্ত ছিল না।

স্কুলের দুঃখও বেশি দিন রহিল না। কিছুদিন পরেই শঙ্কর অন্যান্য ছেলেদেরই মতো সাজ করিতে লাগিল। সে মেধাবী ছাত্র ছিল। কাহাকেও পড়া বলিয়া দিয়া, কাহারো অঙ্ক কষিয়া দিয়া, কাহারো ম্যাপ আঁকিয়া দিয়া শীঘ্রই সে জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাহারা তাহাকে স্বতঃই খানিকটা খাতির করিতে আরম্ভ করিল। পরীক্ষার দিনে তাহার কাছে বসিবার জন্য সহ-পাঠীদের মধ্যে আগ্রহের শেষ ছিল না। কিন্তু এত সুখ বোধ হয় ভগবানের সহিতেছিল না। শঙ্কর থার্ড ক্লাসে উঠিতেই প্রথম ফাল্গুনে একদিন সৃষ্টিধর কঠিন জ্বরে পড়িল। দুদিন পরেই প্রলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল। ইচ্ছাময়ী নানা দেবতার কাছে নানারূপ মানৎ করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন শেষ রাত্রিতে সময় হইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে জাগাইয়া পিতার কাছে লইয়া গেল। সৃষ্টিধর ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছিল। শঙ্করের দিকে তাকাইল কিন্তু চিনিতে পারিল না, বিড়বিড় করিতে লাগিল, 'নে বেলা থাকতে পাড়ি ধর কালবোশেখীর সময়।' রাত্রি না ফুরাইতেই সৃষ্টিধর শেষ হইয়া গেল। শঙ্কর কাঁদিতেছিল, ইচ্ছাময়ী তাহাকে বুকের মধ্যে লইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "এ সব ভগবানের হাত। দুঃখ কোরো না ধন, পরের জন্মে আবার দেখা হবে।" তাহার চোখে জল ছিল না।

৩

মানুষের অন্তরের গোপন পুরীতে যে চেতনা রূপকথার রাজকন্যার মতো ঘুমাইয়া আছে, তাহারই পায়ের ও মাথার কাছে সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির বেশে রহিয়াছে প্রথম শোক ও প্রথম প্রণয়। পিতাকে হারাইবার পর শঙ্কর যেন সংসারকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার প্রত্যেক বৃদ্ধের প্রতি যে মমতা তাহার মনে জাগিল, সেটি একান্তই নূতন। তাহাদের কাহারো অসুখ করিলে শঙ্কর লেখাপড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিত। তাহার পিতার মতো কোনো বৃদ্ধকে পথে বা নদীর বুকে দেখিলে একটা নিরুদ্ধ ব্যথায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিত। পিতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহার মনের কথা সে চিরদিন মায়ের কাছেই বলিয়াছে। কিন্তু তবু বুঝিতে পারিত কী অফুরন্ত স্নেহ সেই বুকে ছিল। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কত দিনের কত খুঁটি-নাটির কথা মনে করিয়া বালিশ ভিজাইত। তাহার ছেলেবেলায় ইচ্ছাময়ী সৃষ্টিধরকে একটি বড় থালায় করিয়া ভাত দিত। শঙ্কর সেই পাতেই খাইতে বসিত। সেই থালার একটি কোণে পিতা তাহাকে ভাত মাখিয়া দিতেন। ডিমভরা কইএর একটুখানি মুখে দিয়া পিতা মাছটা তাহার দিকে সরাইয়া দিতেন। ইচ্ছাময়ী বলিত—'ও কী, ওর জন্যে তো দিয়েছি আর একটা।' সৃষ্টিধর কহিত, 'কত খাব আর, পেট ভীষণ ভরে গেছে।' দুধের

বাটি হইতে একটু দুধ ঢালিয়া লইয়া সৃষ্টিধর তাহার নিজের দিকে ভাত মাখিত। তারপর বাটিভরা দুধ শঙ্করকে দিয়া বলিত, 'এইটুকু এক চুমুকে খাও দিকিনি কেমন পারো।' কতদিন শীতের রাত্রিতে সৃষ্টিধর তাহাকে নিজের কাছে শুইতে লইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে আধ ঘুমন্ত অবস্থায় শঙ্কর অনুভব করিয়াছে তাহার চারিদিকে লেপটি গুঁজিয়া দিয়া সৃষ্টিধর তামাক খাইতে উঠিয়া গিয়াছে। কতদিন জ্বর আসিলে নিজের অনবসরের জন্য ইচ্ছাময়ী তাহাকে বাতাস দিবার জন্য বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। একটু পরে সৃষ্টিধর কহিয়াছে, 'তুই পড়াশুনা করগে যা, আমার বড় শীত করছে।' সেদিন বোঝে নাই এ সবের অন্তরালে কী ছিল। এ সংসারে তাহা আর মিলিবে না। কিন্তু সত্যই কি তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, না ইচ্ছাময়ীর কথা সত্য, একদিন না একদিন আবার মিলিবে!

ইচ্ছাময়ী তাহার নিকটেই শুইত। অনেক দিন রাত্রিতে শঙ্কর তাহার মাকে তাহার ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিত। মুখ ফুটিয়া পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। জানিত যে ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পিতার কথা আসিয়া পড়িবে। ইচ্ছাময়ী একদিন বলিতেছিল, "তুইও ছেলেবেলায় তাঁকে খুব ভালোবাসতিস্। যখন টাকা আদায়ের জন্য বেরোতেন, পথের ধার থেকে যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় দেখতিস, ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে বল্‌তিস— 'মা আমার প্রাণটা যেন পুড়ে যাচ্চে।' আমি হাসতাম,

আর বলতাম, "কী রে তোর প্রাণে আবার আগুন লাগাল কে ?"

কিন্তু এ সংসারে আর কাহারো কাছে এ কথা সে পাড়িত না। এ মর্ম্মের কথার মর্য্যাদা আর কেহ রাখিতে পারিবে না, এ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। কাহারো নিকট তাহার পিতার কথা শুনিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে নাই। সকলের অগোচরে শুধু মাতাপুত্রে ছিল এই বেদনা-মধুর গোপন জীবনটুকু !

সৃষ্টিধর কিছু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল। আর অনেক টাকা তাহার লাগানো ছিল। সংসারে অভাব ছিল না। শঙ্কর পড়িতে লাগিল। পরের বৎসর পূজার সময়ে তাহার সহপাঠী বন্ধু অবনী চৌধুরীদের বাড়িতে যাত্রা। অবনীর সহিত শঙ্করের খুব ভাব। অবনী লেখাপড়ায় মন্দ নয়, তাই শঙ্কর তাহার থেকে কত ভালো এটা সে বেশ বুঝিতে পারিত। অবনী রাস্তার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর যাইতেই তাহাকে বসাইল ও নিজে তাহার নিকট বসিল আসরের ঠিক সামনে। চারিদিকে পান সিগারেটের গন্ধ। যাত্রা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পালা 'মথুরেন্দ্র সংহার'। কংস আসরে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেনাপতিকে যাহারা হরিনাম করে তাহাদের ধ্বংস করিতে আদেশ দিতেছেন।

এত বড় বাড়িতে এ রকম সভায় শঙ্কর কখনো আসে নাই। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে অসংখ্য বাতির ঝাড় জ্বলিতেছে। তাছাড়া স্থানে স্থানে গ্যাসের আলো।

অভিনেতাদের সাজ অতি সুন্দর। রাণীর পোষাক যেন হীরা জহরতে ঝলমল করিতেছে; কখনো কংস আসিতেছেন, কখনো বসুদেব, কখনো যশোদা ও নন্দ, কখনো রাধা ও অন্যান্য গোপীরা। কংসের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া মথুরাবাসীরা অক্রূরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অক্রূর বৃন্দাবনে আসিতেছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ ও রাধার যমুনা-পুলিনে সাক্ষাৎ। অন্যান্য সময়ে গান গাহিয়া দিতেছিল মোক্তারের মতো কাপড় পরা কতকগুলি গায়ক। কিন্তু কৃষ্ণ ও রাধা নিজেরাই গান করিতেছিলেন। চমৎকার গলা। শঙ্কর তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। এমনি সময়ে তাহারি কাছে একটা গোলমাল উঠিল।

তাহাদেরই অনতিদূরে বসিয়াছিলেন ভৈরব ভট্টাচার্য্য। সুপুরুষ, সুগৌর বলিষ্ঠ দেহ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র রেখা। গায়ের রঙ্ যেন চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে অসীম পণ্ডিত ও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী। অবনীরা তাঁহার শিষ্য। অবনীকে ক্রমাগত শঙ্করের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া তাহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও ছেলেটি কে, তোমার কে হয়।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিল—"কোন ছেলেটি?"

ভৈরব কহিলেন—"ঐ যে তোমার কাছেই বসে রয়েছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ। যার সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত গল্প করছ।"

অবনী যেন একটু ভয় পাইয়া গেল—বলিল—"ও, ও আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে।"

"নাম কী?"

"শঙ্কর মাঝি, সৃষ্টিধর সেই যে আর বৎসর মারা গেছে, সে ওরই বাবা।"

ভৈরব শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন না। গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সভার যে অংশ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই অংশে হীনজাতি তাঁহারি সহিত একাসনে বসিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবনীর পিতা নন্দ চৌধুরী ছুটিয়া আসিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ালাপ থামিয়া গেল। শঙ্কর সব শুনিতেছিল। নন্দ চৌধুরী তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এস তো, বাছা।'

অপমানে অভিমানে তখন শঙ্করের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কোনো রকমে নিজেকে সামলাইয়া বলিল—"চলুন।"

নন্দ তাহাকে সভার অন্য কোণে লইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, সেখানে আবার একটি গোলযোগের সূচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, তাই শঙ্কর বসিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নন্দ সরিয়া গেলেন সেই মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া সভাত্যাগ করিল।

বড় বাড়ি। যে উঠানে যাত্রা হইতেছে তাহারি পরে একটি ফুলের বাগান। সেই বাগানের বেড়ার ধার দিয়া

অনেক লোক কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া পান, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় করিতেছে।

যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে। রাধা গাহিয়া বলিতেছেন—'তোমারি কারণে আমি পরি নীলাম্বরী'। কৃষ্ণ গানে উত্তর দিতেছেন, 'আমিও সেইজন্যে রাধে পীতাম্বরধারী।' আর কতকগুলি লোক ধূয়াটি গাহিতেছে—'প'ড়ে প্রণয়-ফাঁদে প্রাণ যে কাঁদে, হায় পোড়া মন প্রবোধ মানে না'।

৪

বাড়িতে ফিরিয়া শঙ্কর এ ঘটনাটির কথা তাহার মাকে বলে নাই। শঙ্করের বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে তাহার মা তাহার সহিত একমত হইবেন না আর মুখে হইলেও তাহার অন্তরের এ দারুণ জ্বালা বুঝিতে পারিবেন না। পরদিন যথাসময়ে সে স্কুলে গেল। অবনীও আসিল। দুজনই দুজনকে কিছু এড়াইয়া চলিল, কিন্তু ছুটী হইবার আগে অবনী তাহার কাছে আসিয়া কহিল—'কাল একটু সকালে সকালে এস ভাই, কতগুলি deduction আমি পারি নি, তোমার কাছে বুঝে নেব।' শঙ্কর উত্তর দিল—'বেশ'।

শঙ্কর মনে মনে অবনীকে কম দোষী করে নাই। অবনী একবার প্রতিবাদ করে নাই—একবার বলে নাই যে সেই তাহাকে ওখানে নিয়া বসাইয়াছিল। সে চলিয়া আসিবার

সময়ে তাহার সাথে আসে নাই। তবু পরদিন কিছু আগেই স্কুলে আসিল। অবনী আসিয়াই শঙ্করের হাত ধরিয়া কহিল —"আমার উপর সেদিন রাগ করনি তো ভাই। কাল সারাদিন লজ্জায় তোমার দিকে তাকাতে পারিনি।" শঙ্কর আঁক কসিবার খাতাখানি বাহির করিতে করিতে উত্তর দিল— "তোমার আর দোষ কী।"

ব্যাপারটা যদি এইখানেই শেষ হইত,তাহা হইলে হয়তো শঙ্কর মনে আর কিছু রাখিতে পারিত না। কিন্তু অবনী ক্ষমা চাহিয়াছে নিজের জন্য,তাহার পিতা বা ভৈরব ভট্টাচার্য্য কোনো অন্যায় করিয়াছেন, পাছে এই স্বীকার করা হইয়া থাকে এজন্য অবনী আবার বলিল—"আর ওতে তোমাদেরও পাপ হয়।"

"পাপ?" বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে শঙ্কর অবনীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—"কই, তোমার deduction কই?"

মনের আঁধার মনেই রহিয়া গেল। একথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। অথচ দিনরাত এ আঘাত কাঁটার মতো বেঁধে। পিতার মৃত্যু মাতাপুত্রকে যে গূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, তাহাও যেন শিথিল হইয়া গেল। মায়ের সহিত আর বেশি কথা হয় না। ইচ্ছাময়ীর লক্ষ্য এড়ায় না। মনে করিল শঙ্কর শোক ভুলিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন রবিবারে শঙ্কর মাকে বলিল—"মা আমি নীলগঞ্জের বাজারে যাব। আমার কাপড় নেই, তোমারও বেশি নেই, কিছু কাপড়চোপড় কিনে আনি।"

নীলগঞ্জের বাজার শঙ্করদের গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে। সেখানে থানা, ডাক্তারখানা সবই আছে। কাপড়-চোপড়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন—কিন্তু এ কাজের ভার আর কাহাকেও দেওয়া যায় কি না এই অপেক্ষায় ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে কিছু বলে নাই। শঙ্কর প্রস্তাব করিতে ইচ্ছাময়ী বিশেষ আপত্তি করিল না, শুধু বেশি রাত করিতে বারণ করিয়া দিল।

নীলগঞ্জে খৃষ্টানদের একটি মিশন ছিল। সেইখানে যাওয়া ছিল শঙ্করের উদ্দেশ্য। সে শুনিয়াছিল খৃষ্টধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। সব সমান। কিন্তু সে কথা তাহার মাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না এবং এ সম্বন্ধে কোনো একটা সুস্পষ্ট ইচ্ছাও তাহার মনে আসে নাই।

নীলগঞ্জে পৌঁছিয়া মিশন-হাউসের আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যখন সেখানে প্রবেশ করিল, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়াই তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া আসে। কারণ কী বলিবে, কী করিবে এসব কিছু ঠিক করিতে পারে নাই। তারপর এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত কি না এ সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহার আর উপায় ছিল না। মিশন-হাউসের ফটক পার হইতেই একটি সব্জী-বাগান। সেখানে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক কাজ করিতেছিলেন। শঙ্করকে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

শঙ্কর বলিল—"হাঁ, আমি এখানকার পাদরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—অনেক দূর থেকে।"

ভদ্রলোক কহিলেন—"আমিই পাদরী সাহেব। চলো আমার বসবার ঘরে চলো।"

তারপর তিনি শঙ্করকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন ও দুজনে বসিবার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি খৃষ্টান ?"

"না—আমি আপনাদের ধর্ম্মের কথা শুনতে এসেছি।"

"সে তো সুখের কথা। কতদিন ধ'রে কী ক'রে তোমার মনে এ ইচ্ছা এল ?" পাদরীর স্বরে একটি শান্ত স্নেহের ভাব ছিল। সে জন্যই হৌক বা অনেক দিনের নিরুদ্ধ ব্যথা কাহাকে বলিতে পারিবার অবসর পাইয়াই হৌক, শঙ্কর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা—তাহার প্রথম স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সেই যাত্রা শুনিবার রাত্রির কথা অবধি—অনর্গল বলিয়া গেল। কোনো কিছু গোপন রাখিল না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"শুনেছি আপনাদের ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই, সে ধর্ম্মে কি আমাদের আশ্রয় আছে ?"

পাদরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ, একটি আঘাত পেয়ে আমার কাছে এসেছ। তোমার আশা আমাদের ধর্ম্মে এমন আঘাত নেই। কিন্তু অত্যাচার কোনো না কোনো রকম সব সমাজেই আছে। আর আমাদের ধর্ম্ম তো শুধু জাত মানে না ব'লেই পৃথক

ধর্ম্ম নয়। তার মধ্যে আরো অনেক কথা আছে। তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?"

শঙ্কর জানাইল সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে।

পাদরী কহিলেন—"আমাদের ধর্ম্ম কী সে তুমি যিনি আমাদের ধর্ম্মের মূল তাঁর কথা থেকেই সব চেয়ে ভালো বুঝবে।"

তারপর অন্য ঘরে উঠিয়া গিয়া তিনখানা বই লইয়া আসিলেন। একখানি তাঁহারি প্রণীত খৃষ্টধর্ম্ম—সহজ বাংলাতে লেখা। অন্য দুখানি St. Mathew'র Testament, ইংরেজি ও বাংলাতে। বই কয়খানি শঙ্করকে দিয়া কহিলেন—"এই কয়খানি বই তোমার অবসর মতো পড়ে দেখো। তারপর যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে আবার দেখা কোরো।"

শঙ্কর উঠিল। পাদরী তাহাকে ফটক অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া বাগানে ফিরিয়া গেলেন। শঙ্কর বাজারে গেল এবং যাহা কিনিবার ছিল, কিনিয়া বেশি রাত্রি হইবার আগে বাড়িতে ফিরিল।

বইগুলির ছত্রে ছত্রে যেন মানুষের গৌরব ভরা। ছোট বড় সংসারে থাকিতে পারে, বিধাতার চোখে নাই। পবিত্রতা অপবিত্রতা জন্মের ধারা বহিয়া চলে না। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান হইতে কে শুনাইল তাহাকে এই অমৃত বাণী। তাঁহারো জন্ম হীন কুলে—এ পৃথিবীতে তাঁহার দিন বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনিই বলিতেছেন—

আমি চিরদিন তোমাদের সাথে আছি—যত দিন সৃষ্টি রহিবে ততদিন আমি তোমাদের সাথের সাথী।

শঙ্কর ঠিক করিল খৃষ্টান হইবে। কিন্তু কথাটা মাকে বলা চাই। মা খুসী হইবেন বলিয়া একদিন রাত্রিতে ইচ্ছাময়ীকে আবার তাহার ছেলেবেলার গল্প বলিতে বলিল। অতি মূর্খ মাও নিজের সন্তানের বেলাতে অনেক কথা বুদ্ধিমতীরই মতো বোঝে। আর ইচ্ছাময়ী মূর্খ ছিল না। কথাটি যে আর কোনো কথার পূর্ব্বাভাস সে সেটা বুঝিল, কিন্তু তবু যেমন ভাবে সব কথা কহিত সেই ভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ইচ্ছাময়ী শেষ না করিতেই শঙ্কর কহিল—'মা'।

'কী?'

'আমি মনে করেছি খৃষ্টান হব।'

ইচ্ছাময়ী যেন ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই, বলিল—'কী হবি?'

'খৃষ্টান'।

'কেন?'

মায়ের মন গলিয়াছে মনে করিয়া শঙ্কর পাদরীর নিকট যাহা বলিয়াছিল, আবার সেই সব কথা মায়ের কাছে বলিল।

ইচ্ছাময়ী কহিল—'এতে খৃষ্টান হবার কী কথা আছে? জাত-জন্ম ভগবান করেছেন। ব্রাহ্মণ কলির দেবতা। আমি

তোমার দোষ দিই না, দোষ অবনীর, সে তোমাকে ওখানে নিয়ে বসল কেন ?”

হায়রে, অবনীও তো এই সুরে কথা বলিয়াছিল। তাহার অন্তরের দুঃখের সাড়া কি জগতে কোনো হৃদয়ে নাই? খৃষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা সে মাকে বলিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু বলিল না।

খানিক পরে ইচ্ছাময়ী কহিল—‘আমার কাছে আয়।’

শঙ্কর মায়ের বিছানায় উঠিয়া গেল। ইচ্ছাময়ী কহিল,—‘আমার মাথায় হাত দে।’

শঙ্করের আর কোনো উৎসাহ ছিল না, মাথায় হাত দিল। ইচ্ছাময়ী বলিল,—‘এবার বল্ যে কোনোদিন বাপ-পিতাম’র ধর্ম্ম ছাড়বিনে।’

শঙ্কর শপথ করিল।

ইচ্ছাময়ী আবার কহিল—‘যদি করিস, সেদিনই আমার মরা-মুখ দেখবি।’

শঙ্কর মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সব শুনিল। বুঝিল যে তাহার কোনোদিন খৃষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা নাই—আর বুঝিল মায়ের নিকট হইতে সে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেখানে সে নিতান্ত একাকী।

শঙ্কর নীলগঞ্জে আর ফিরিয়া গেল না। পাদরীও তাহার আর খোঁজ করেন নাই।

৫

কিছুদিন ধরিয়া মাতাপুত্রের চিন্তা বিভিন্ন পথে চলিল। ইচ্ছাময়ী ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিত —'কী করে এ অবোধ বালককে বোঝাই সব কথা। সিদ্ধেশ্বরী তলার মাদুলী এনেই না ওকে পেলাম। তারপর যখন হামে ও যেতে বসেছিল, তখন ঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে চরণামৃত না এনেই ওকে বাঁচাই। ও বলে খৃষ্টান হবে। মা সিদ্ধেশ্বরী, যদি সারা জীবন তোমার নাম ক'রে চলে থাকি, মা, তবে আমার বুকে এমন দাগা দিয়ো না।'

শঙ্কর ভাবিত—'জীবনে এ কী গরমিল। যাকে সব চেয়ে ভালোবাসি, সেই আমার অন্তর থেকে সব চেয়ে দূরে। কেমন করে মাকে বোঝাই খৃষ্ট কে, কী তাঁর বাণী! তিনি তো আমাদের মতো লোকের জন্যই পৃথিবীতে এসে নিজের রক্তে আমাদের মুক্তির দ্বার খুলে গেছেন।'

একদিন রাত্রিতে শঙ্করের ঘুম পাইতেছিল না। মনে করিতেছিল মার মনও কি খৃষ্টের দিকে নেওয়া যায় না। ইচ্ছাময়ীকে ডাকিয়া কহিল 'মা, তোমার কথা যদি ঠিক না হয়?'

ইচ্ছাময়ী জাগিয়াই হাতে কী পয়সা আছে না আছে তাহার হিসাব করিতেছিল। বলিল, 'আমার কোন্ কথা?'

'এই ছোট বড় করা যদি ভগবানের হাত না হয়?'

'তবে কার হাত?'

'এটা যদি মানুষেরই ব্যবস্থা হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে তো এ নেই, তারাও তো মানুষ।'

ইদানীং ইচ্ছাময়ীর রক্ত ঐ খৃষ্টান শব্দটি শুনিলেই গরম হইয়া উঠিত। কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—'আর জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করতেই হবে বাবা।'

ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা শঙ্করের বলিবার ছিল। পাদরীর প্রণীত "খৃষ্টধর্ম্মে" জাতির বিরুদ্ধে, জন্মান্তরের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি সে পড়িয়াছিল এবং সেগুলি তাহার কাছে মনে হইয়াছিল অকাট্য। কিন্তু মাকে তাহার রাগাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাই কথাটা কিছু অন্যভাবে ঘুরাইয়া কহিল—'এই ধরো যদি তোমার পুণ্য বাবার চেয়ে বেশি হয়, কিংবা আমি যদি পাপ করি, তাহলে পরজন্মে আর কী করে আমাদের দেখা হবে?'

ইচ্ছাময়ী এবার সত্যই রাগ করিয়া উত্তর দিল—'দু'পাতা ইংরেজি পড়ে তোর যে কী হয়েছে জানি না, আমার পুণ্য, তাঁর পুণ্য, তোর পুণ্য এ কি সব পৃথক? সতীর স্বামী কখনো বদ্‌লায়, না তার সন্তানকে সে কোনোদিন হারায়?'

ইহার পর আর কথা চলে না। পরের দিন প্রাতেই ইচ্ছাময়ী তাহাদের জাতির পুরোহিতের কাছে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া আসিল। শঙ্করের মনে এ চিন্তা এতদিন আছে ভাবিয়া তাহার মন আশঙ্কায় ও অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার আর দু-একজনকে গোপনে শঙ্করের জন্য একটি মেয়েও দেখিতে বলিল।

শঙ্কর লেখাপড়ায় অবহেলা করিত না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন ছুটি, এমন সময়ে তাহাদের পাড়ায় কলেরা দেখা দিল। ঘরে ঘরে রোগী। রাস্তায় চলিতে গেলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। প্রতিদিন কাহারো না কাহারো মৃত্যু হইতেছে। কেহ কাহারো বাড়িতে বিশেষ যায় না। সকাল সন্ধ্যা নগর-সংকীর্ত্তন হইতেছে।

এ রোগ বড়-ছোটর ভেদ রাখিল না, সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ভৈরব গেলেন, নন্দ চৌধুরী যাইতে যাইতে রহিয়া গেলেন। ইচ্ছাময়ী গেল। গ্রামে ইচ্ছাময়ীর এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই তাহার মহাজনীর কাজকর্ম্ম দেখিয়া দিত সেও গেল। ঘরে ঘরে শোকের রোল উঠিল। তারপর কোনো হিংস্র জন্তুর মতো চারিদিকে থাবা মারিয়া ফাল্গুনের শেষে মারী অন্তর্হিত হইল।

মা থাকিলেন না, অথচ সংসার চলিবে, এ চিন্তা একদিন শঙ্কর করিতে পারিত না। কিন্তু সংসার তো চলিলই, এমন কি মায়ের মৃত্যুর পরদিন নিজের রান্না হবিষ্যান্ন যখন ক্ষুধার জ্বালায় পেট ভরিয়াই খাইল তখন নিজের প্রতি তাহার অসীম ঘৃণার উদ্রেক হইল। মানুষকে ভোলা এতই সহজ? তাহার অভাবে দিন রাত হয় না, সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ক্ষুধাও পায়, ঘুমও হয়? অথচ মানুষ ভাবে সে আর একজনকে ভালোবাসে।

কিন্তু তখনো সে বোঝে নাই তাহার জীবন কতখানি খালি হইয়া গেছে। হঠাৎ হাত বা পা কাটা গেলে যেমন কিছুক্ষণ

কোনো বোধ থাকে না, তারপর আসে অসীম যন্ত্রণা এবং তারো পর চিরদিনের অভাব, শঙ্করেরও তেমনি মাতৃবিরহের *বেদনা দিনের পর দিন গভীরতর হইয়া* উঠিল।

ইচ্ছাময়ী তাহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া যাইবার অবসর পায় নাই। শঙ্কর তাহাদের মহাজনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। কিন্তু দুই এক মাস যাইতেই খাতকের পর খাতক আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—টাকা ফেরৎ দিয়াছে। ইচ্ছাময়ী কাজের গতিকে খত ফেরৎ দিতে পারে নাই। নিজের লোক বলিয়া তাহারাও বিশেষ জোর করে নাই। কিন্তু এত শীঘ্র ইচ্ছাময়ী চলিয়া যাইবে এ কেহ ভাবিতে পারে নাই। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। এখন যদি শঙ্করের অসুবিধা না হয় তবে খতখানি ফেরৎ দিলে ভালো হয়। তবে যদি শঙ্কর ব্যস্ত থাকে তাহারা আর একদিন আসিতে পারে।

হীরু ভট্টাচার্য্য অধিকাংশ খতের লেখক। সে সাক্ষী দিল যে টাকা প্রকৃত পক্ষেই দেওয়া হইয়াছে—তাহারই সামনে।

শঙ্কর সব খতই ফেরৎ দিল। দু একজন খাতক তখন দেশে ছিল না। শুধু তাহাদের খত রহিল। সেগুলি তামাদি হইবার এখনো সময় আছে।

মায়ের মৃত্যুর পর সে আর স্কুলে যায় নাই। স্কুলের বেতন দিয়া পড়িবার শক্তি তাহার আর নাই। বরাবর ফার্ষ্ট হইয়াছে, আশা করিয়াছিল হেডমাষ্টার ডাকিয়া একটা

কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। দিনের পর দিন গেল। তাহার আর ডাক পড়িল না।

একজন বিধবা প্রতিবেশিনী দুবেলা তাহাকে রাঁধিয়া দিয়া যাইতেন। কিন্তু চলে কী করিয়া। যে টাকা ইচ্ছাময়ী রাখিয়া গিয়াছিল তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। শ্রাদ্ধে কম টাকা খরচ হয় নাই। সে নিজে যাহা খরচ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রায় দ্বিগুণ খরচ হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিয়াছে বাপ মা কাহারো দুইবার মরে না, শঙ্কর যেন টাকার কথা না ভাবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে পরামর্শ দিতে কেহ আসে নাই।

একবার মনে করিয়াছিল সেই পাদরী সাহেবের কাছে যায়। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা তাহার মায়ের কথা ভাবিয়া তাহা পারিল না। তাহার যতটুকু শিক্ষা এবং যে কুলে তাহার জন্ম, তাহাতে তাহার চাকরীর কোনো আশা নাই। ভাবিয়া কিছুরই যখন কিনারা করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে একদিন নিশিকান্ত দেখা করিতে আসিল।

নিশিকান্ত পাঠশালায় তাহার উপরে পড়িত এবং বয়সও তাহার হইতে প্রায় দশ বৎসর বেশি। পাঠশালা ছাড়িয়াই সে ব্যবসা ধরিয়াছে। বৎসরে দুএক বার গ্রামে ফেরে। পাড়ায় তাহার খ্যাতি অখ্যাতি দুইই ছিল। যতদিন পাড়ায় থাকিত পাড়া মাতাইয়া রাখিত। আজ এবাড়িতে তাস, কাল সে বাড়িতে পাশা। প্রায় রোজ রাত্রিতে সংকীর্ত্তন। ছেলেদের খেলনা বানাইয়া দিত। মেয়েদের ফরমাস

খাটিত। সব চেয়ে লম্বা গাছের নারিকেল সেই পাড়িয়া দিত। অসুখ বিসুখ বা ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার হাতে ভার দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইত। শুধু তাহার সমবয়সীরা তাহাকে পছন্দ করিত না, বলিত মেয়েদের দিকে ও যেন কেমন নজরে তাকায়।

নিশিকান্ত ও শঙ্করে অনেক আলাপ হইল। উঠিবার আগে নিশিকান্ত কহিল—'একটা কথা মনে করে এসেছিলাম, যদি কিছু না মনে করো তো বলি।'

শঙ্কর বলিল—'তুমি যে কুটুম্বিতা আরম্ভ করলে—বলোই না কী কথা?'

'আজ কাল শুধু মাঝিগিরিতে দিন চলে না। আমি তাই শীতকালে মাছের ব্যবসাও করি কিছু কিছু। কোনো বড় হাটে মাছ কিনে ছোট হাটে বিক্রি করি। যেগুলি জীয়িয়ে রাখা না যায়, সেগুলি কেটে নুন মাখিয়ে রাখি। আর কই মাগুর এ সব তো রাখা যায়। যে লোকটি আমার সাথে কাজ করত, নানা গোলমালে সে চলে গেছে। তুমি লেখাপড়া করেছ, হয়তো তোমার ভালো লাগবে না। কিন্তু এই তো আমাদের জাতের ব্যবসা, যদি ভালো লাগে আমার সঙ্গে আসবে কি—মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।'

শঙ্কর যেন আকাশ হাতে পাইল। বলিল—'মোটা ভাত কাপড় ছাড়া কিছুই চাই না, নিশিদা। নিজের নৌকা নেই, না হলে একথা আমিও ভেবেছিলাম। সবাই মুখে না হলেও মনে মনে আমার লেখাপড়া শিখতে যাওয়া নিয়ে

ঠাট্টা করে ব'লে আমি আর কারুর নৌকাতে কাজও চাইতে পারিনি।'

তারপর একদিন সকালে পাল তুলিয়া শঙ্করকে লইয়া নিশিকান্তর নৌকা যখন গ্রামের ঘাট ছাড়িল—পাড়াতে অনেকেই বলিল—'বলেই তো ছিলাম লেখাপড়া আমাদের সয় না। বাপ গেল, মা গেল। লেখাপড়া শেষ হল, রইল কিন্তু জাত ব্যবসা।'

শঙ্করের মনে কিন্তু অপূর্ব্ব পুলক জাগিয়া উঠিল। পালে তখন বাতাস লাগিয়াছে। এ যেন রূপকথার পাখী, ডানা মেলিয়া নীলাকাশ ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। নদীর জলে, কূলের ঘাসে, এ কী গন্ধ। আকাশে এক সারি গাংচিল যেন কুচকাওয়াজ করিতেছে। যেন সাদা মেঘের টুকরো সব, এক একবার পালকে ভোরের রোদ লাগিয়া হীরের মতো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। ঘাটে ঘাটে ঘট কক্ষে গ্রামের বধূরা। কাহারো স্নান হইয়া গিয়াছে, সখীর জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ জল ভরিতেছে, কেহ বা গামছায় বুক ঢাকিয়া আঁচল কাচিয়া লইতেছে। নিশিকান্ত হালে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—

"আমারে ডাক দিয়েছে, ভাই, সোনার দেশের গাঙ্।"

৬

নিশিকান্তের কার্য্যকলাপ শঙ্কর অবাক হইয়া দেখিত। তাহার কথাবার্ত্তা অবাক হইয়া শুনিত। যতই দিন যাইতে

লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল নিশিকান্তর এ জ্ঞানবুদ্ধির কাছে তাহার পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত তুচ্ছ। কোন্ তিথিতে কখন জোয়ার আসিবে, কোন্ নদীর কূল কোথায় ভাঙ্গিতেছে, কোন্ ধারে স্রোতের জোর বেশি, কোন্ বাঁকেতে পাল চলিবে, সবই তাহার জানা। বাতাস দিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া বলিত বৃষ্টি হইবে কিনা। আকাশে যখন মেঘ নাই তখন বাতাসের গতি ও দিনের গরম দেখিয়া বুঝিত পারিত বিকালে ঝড় হইবে কিনা। নদীর বুকে অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি খুঁজিয়া পাইত নৌকা রাখিবার জায়গা। শরীরে তাহার অসীম শক্তি, শঙ্করকে বেশি খাটিতে দিত না। উজানে দাঁড় বাহিত সেই, প্রয়োজন হইলে গুণ টানিত সেই। তারপর দিনের শেষে যখন রাঁধিতে বসিত, তখন শঙ্কর বলিত—'দাও না, নিশিদা, আমি কিছু করি।'

নিশি হাসিয়া বলিত—'করবি রে, সবি করবি। ছুদিন সবুর কর্। আর কিছুদিন পরে তোর নিশিদা শুধু পায়ের উপর পা দিয়ে শুয়ে থাকবে, তোকেই করতে হবে সব। খাটুনীর জীবন আমাদের, ছুদিন একটু আরামে রইলেই বা।'

শঙ্করের উপর তাহার অসীম মমতা ছিল! সর্ব্বদা এমন ভাবে চলিত যেন শঙ্করের উপযুক্ত কাজ এ নয়, এ কাজের কঠোরতা হইতে তাহাকে বাঁচানো চাই। অথচ তাহাকে শিখাইতও সব। ঝড় আসিলে হাল ধরিতে বলিত ও নিজে কাছে বসিয়া রহিত। দরকার হইলে দাঁড় দিয়া কী করিয়া

হালের কাজ ও হাল দিয়া দাঁড়ের কাজ করা যায়, তাহা দেখাইত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'তোমার মতো সব বিষয়ে পাকা কবে হতে পারব, নিশিদা।' নিশিকান্ত উত্তর দিত—'পারবি, পারবি, আগে রোদ লাগা। তবে দু-একদিকে আমার মতো তোর পেকে কাজ নেই।' শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'ব্যাপারটা কী?' নিশিকান্ত চোখে মুখে এক অগাধ রহস্যের ভাব আনিয়া মাথা নাড়াইয়া জানাইত এখনো বলিবার সময় হয় নাই।

নিশিকান্তর সহিত কাজ করিয়াও সুখ ছিল। সর্ব্বদা হাসিমুখ। দোষ কারো দিলে নিজের দোষই দিত। কখনো পাল তুলিবার পর, কখনো বা দিনের শেষে ছুটি মিলিলে নৌকার উপর বসিয়া হয় বাজাইত বাঁশী, না হয় তুলিত গান। মুগ্ধ হইয়া শঙ্কর শুনিত। বাঁশী যেন কাঁদিতে থাকিত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'এটা কী বাজালে?" নিশিকান্ত বলিত--মাথুর, না হয় মান, না হয় বিরহ। ক্রমে শঙ্কর বাঁশীর সুর ধরিতে শিখিল।

নিশিকান্তের উপর স্নেহে, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে শঙ্করের মন ভরিয়া গেল।

শীত আসিল। তখন যাত্রী কম। মাছের ব্যবসা করিবার কথা। নিশিকান্ত নৌকা বিরামপুরের বন্দরে লইয়া গেল। প্রায় এক মাইল লম্বা বাজার ও হাজার হাজার নৌকা। এখান হইতে সকালে মাছ কিনিয়া সেই দিন সন্ধ্যাতেই কাছে কাছে হাটে কিছু লাভে বিক্রি করা যায়।

কিন্তু পরিশ্রমের কাজ, বিরামপুরে ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। তারপর রান্না-বান্না, খাওয়া ও ঘুমানো। আবার পরদিন ভোরে বাজার করা, মাছ আনা, নৌকার খোলে তাহাদের জীয়াইয়া রাখা, কাজের অন্ত ছিল না। কিন্তু নিশিকান্তের কোনো পরিবর্ত্তন নাই। সেই অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই হাসিভরা মুখ। শুধু জোর করিয়া রান্নার ভারটা শঙ্কর লইয়াছিল।

ক্রমে শীতও শেষ হইয়া আসিল। দেশে ফিরিবার আর বেশি দেরি নাই। একদিন দুপুরে খাইবার পর নিশিকান্ত বলিল—'তোকে একজন দেখতে চায়।'

বিস্মিত হইয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে, কে ?'

'কাজল গো কাজল।'

'কে কাজল ?'

এবার নিশিকান্ত হো হো করিয়া উঠিল। বলিল—'নিশিকান্তের ছোট ভাই তার ভাজের খবর রাখে না।'

শঙ্করের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল, বলিল—'কী যে বলছ তুমি, পরিষ্কার করে বলো না সব, কবে বিয়ে করলে, কিছুই তো শুনি নি।'

নিশিকান্ত হাসি থামাইয়া কহিল—'শোনবার কথা নয়। তুই বড় ভালো ছেলে, তোকে বলতে চাইওনি। কিন্তু কী যে তার সাধ হয়েছে তোকে দেখবে। তোর গল্প করি কিনা সব সময়ে।'

'কিন্তু সে কে, নিশিদা ?'

'সে হচ্ছে কাজল বোষ্টমী, আদর করে বলি আমার চোখের কাজল। দেশ বিদেশ ঘুরি, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটি, ওর ওখানে গিয়ে একটু মনটা জুড়োইরে'—তারপর শঙ্করের দিকে একটা গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাগ করলি নাকি, শঙ্কু—'

শঙ্কর এবার একটু একটু বুঝিতে পারিল। বলিল—'রাগ করব কেন, কিন্তু এবার গেলেই বা তার কাছে কবে?'

নিশিকান্ত আবার হাসিল। উত্তর দিল—'যাই তো রোজই, যখন যাই আর ফিরি, তখন শঙ্কু ভায়া যে ঘুমে অচেতন।'

শঙ্করের কৌতূহল হইল। কিন্তু যাইবার উৎসাহ ছিল না। জিনিসটা তাহার বিশেষ ভালো লাগিতেছিল না; তবে আপত্তিও করিল না বিশেষ। নিশিকান্ত যাহাই করুক তাহার তুলনা জগতে নাই। আর তাহার সাথেই তো যাইতেছে।

বন্দর ছাড়াইয়া গ্রাম, সেই গ্রামের কোণে একখানি মাত্র ঘরে কাজল থাকে। চারিদিকে বেড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উঠানে শুক্‌নো পাতাটি নাই। এক কোণে একটি তুলসী-মঞ্চ। তাহারই পিছনে লাউএর মাচা। আর এক কোণে একটি কূয়া। বারান্দায় দুখানা ছোট চৌকি। অন্যদিকে একটি মাদুরে বসিয়া কাজল ডাল বাছিতেছিল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বাড়িতে ঢুকিয়াই নিশিকান্ত উচ্চকণ্ঠে কহিল—'এই যে এনেছি আজ, কাজল।

নয়ন ভরে দেখো এবার, এমন ভালোছেলেটি আর পাবে না।'

কাজল উঠিয়া দুজনকে বসিতে দিল। শ্যামাঙ্গী, ঈষৎ স্থূল কিন্তু ঋজুদেহা। এলায়িত চুল পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। হাতে কয়গাছি সোনার চুড়ী, কপালে চন্দনের রেখা।

কথা বেশির ভাগ নিশিকান্তই কহিল। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় এই প্রথম। সে খানিক-ক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া কথাই কহিতে পারিল না। বিশেষতঃ যখন জানিত নিশিকান্তের সহিত এ রমণীর কী সম্বন্ধ। কাজলের মধ্যে লজ্জার আড়ষ্টতা ছিল না, লজ্জা ভাঙ্গার চাঞ্চল্যও ছিল না—যেটুকু কথা কহিল, সে শঙ্করেরই সহিত এবং সে কথার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই।

সেদিন সকালে নিজেদের প্রয়োজনের কয়েকটি জিনিস কেনা হয় নাই। নিশিকান্ত শঙ্করকে রাখিয়া সেগুলি কিনিতে গেল এবং বলিয়া গেল এখানে ফিরিয়া শঙ্করকে লইয়া যাইবে।

শঙ্করের ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু কাজলের সামনেই এ কথা বলিতে কেমন বাধিয়া গেল। নিশিকান্ত যাইবার সময় আবার রসিকতা করিয়া বলিয়া গেল—'কাজল, ও কিন্তু খুব ভালো ছেলে।'

নিশিকান্ত চলিয়া গেলে কাজল ঘরের পিলসুজ জ্বালাইল। আর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া আঁচলে ঢাকিয়া তুলসী-মঞ্চে রাখিয়া দিয়া আসিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'এবার ঘরে চলো, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।'

শঙ্কর কহিল—'এই কাদাপায়ে ঘরে যাব—জল পেলে ধুয়ে নিতুম।'

ঘরের ভিতর হইতে কাজল ঘটি ভরিয়া জল আনিল। তারপর শঙ্করকে তাহার চৌকিটা বারান্দার প্রান্তে লইয়া যাইতে বলিল। শঙ্কর জল লইতে হাত বাড়াইল এবং কিছু বলিতে পারিবার আগেই নিজ হাতে জল ঢালিয়া কাজল পরিষ্কার করিয়া শঙ্করের পা ধোয়াইয়া দিল। তারপর হাতের গামছা দিয়া মোছাইয়া দিল। ঘরের বেড়ায় রাধাকৃষ্ণের নানারূপ যুগল মূর্ত্তির ছবি। সন্ন্যাসীর বেশে চৈতন্যদেবের ছবিও একটা ছিল। এক কোণে একখানা খাট। পরিষ্কার বিছানা, ও রঙীন মশারি আর একদিকে একটি আল্‌নায় ভাঁজকরা কয়েকখানি শাড়ী রহিয়াছে। ঘরের মেজেতে নানারূপ তৈজসপত্র। পিছনে আর একটি বারান্দা ঘেরা, সেখানে রান্না হয়।

কাজল বারান্দা হইতে মাতুর আনিয়া ভিতরে পাতিয়া দিল। শঙ্কর বসিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি রাঁধতে যাবেন না?'

কাজল কহিল—'আমি এক বেলাই রাঁধি, রাত্রিতে কখানা রুটি গড়ে নি, সকাল বেলার তরকারি থাকে।'

ধীরে ধীরে কাজল তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিল। দেশের কথা, সংসারের কথা, তাহার জীবনের কথা—কী কোমল কণ্ঠস্বর, কী স্নিগ্ধ চাহনি, যেমন বড় চোখ তেমনি ঘন ভ্রূ ও চোখের পাতা। মায়ের মৃত্যুর পর শঙ্করের অন্তর যেন একটু

স্নেহের জন্য তাহারি অগোচরে ভিখারী হইয়া ঘুরিতেছিল, অনবদ্য তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। জগৎ-সংসারের কাছে এ নারী যাহাই হৌক, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে।

কাজল বলিতেছিল—'নিশিকান্ত তোমায় ভালোবাসে। পৃথিবীতে ও যে কাউকে এমন করে ভালোবাসতে পারে, আমার মনে হয় নি। তাই তোমায় দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল।'

শঙ্করের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে তাহাই যদি হয়, তবে এখানে আসে কেন। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। বরং কাজলের কথায় সায় দিয়া নিশিকান্ত তাহাকে কত ভালো-বাসে, তাহাকে কিরূপ খাটিতে দেয় না, কী বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সব বলিতে লাগিল।

তারপর আরো কথা হইবার পর কাজল বলিল—'এখন তো চিনলে আমার বাড়ি, এসো মাঝে মাঝে। নিশিকান্তের অপেক্ষায় থেকো না। ও মন-ভোলা লোক, কখন যে ওর কী মনে হয় বোঝা দায়।'

যাহাকে লইয়া এ দেখা, এ যেন তাহারই অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুর। শঙ্করের যেন কেমন লাগিল, কোনো উত্তর দিল না।

এমন সময়ে নিশিকান্তের গলা পাওয়া গেল।

সে রাত্রিতে নৌকায় ফিরিয়া নিশিকান্ত যেন মাতাল

হইয়া উঠিল। গানের উপর গান। যখন নদীর বুক কাঁপাইয়া উচ্চকণ্ঠে গান তুলিল—'সে হোক না কালো, আমার ভালো চোখে লেগেছে', তখন যেন শঙ্করের বুক এক কারণহীন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে নিশিকান্ত বাঁশী ধরিল। কিন্তু আজ বাঁশীর অন্য সুর, সে কান্না যেন নাই, যেন সেই নদীর জোয়ারেরই মতো, কূল ভরিয়া সুরের জোয়ার আসিয়াছে। অনেক রাত্রিতে বাঁশী রাখিয়া শঙ্করকে একবার জড়াইয়া নিশিকান্ত কহিল—কেমন করে বলব, রে শঙ্কু, কী ভালো লেগেছে আজ। তোর কাছে আজ আর আমার কিছু গোপন নেই।'

শুধু কেহ জানিত না যে দূর সাগরের গোপন আহ্বান লইয়া শঙ্করেরও দেহ মনে জোয়ার আসিয়াছে, একই সাথে দুই কূলে ভাঙ্গনের মাতন সুরু করিয়া দিয়াছে।

৭

সৃষ্টিতে সব চেয়ে ঘৃণা করে লোহা চুম্বককে—কারণ তাহার টানিবার শক্তি আছে কিন্তু আপন করিয়া লইবার শক্তি নাই। শুধু শঙ্করের মনে এ ঘৃণা জাগিতেছিল নিজের উপর—কাজলের উপর নয়। কাজল যদি তাহার মনের সকল দ্বিধা কাটাইয়া সকল বাধা ভোলাইয়া নিজের কাছে টানিয়া লইতে পারিত, শঙ্কর বাঁচিত। অথবা স্বপ্নের মতো ঘুম ভাঙ্গিবার সাথে সাথে মন হইতে সরিয়া যাইত, তাহা হইলেও শঙ্কর শান্তি পাইত। কিন্তু অদৃষ্টে তাহা

তাহার ছিল না। দেশে ফিরিবার আর চার-পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। নিশিকান্তের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্কর কাজলের কাছে আর যায় নাই। নিশিকান্তের খুসীর সীমা ছিল না। কাজলকে জিজ্ঞাসা করিত—'কী, বন্ধুকে লাগল কেমন?' শঙ্করকে বলিত—'কাজল যে রোজই তোর কথা জিজ্ঞেস করে, গতিক ভালো নয় তো।' নিজের শক্তির উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই হাতের ঘুড়ীর মতো নিজের কল্পনাকে মনের আকাশে খেলাইয়া সুখ পাইত। শঙ্কর অনেক সময়ে কর্কশ উত্তর দিত। পরে অনুতপ্ত হইয়া সহস্র রকমে নিশিকান্তকে খুসী করিতে চেষ্টা করিত। নিশিকান্ত কোনোটিই লক্ষ্য করিত না।

কিন্তু পড়ন্ত রোদে ডিঙির উপর ডিঙি যখন নদীর বুক যেন না ছুঁইয়া ভাসিয়া আশ-পাশের গ্রামে ফিরিত, তারপর নদীর বুকে যখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিত, তখন শঙ্করের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত একটি দীপালোকিত গৃহ, ঘন পল্লবস্নিগ্ধ দুটি নয়ন, আর এই সন্ধ্যারই মতো উদাস বৈরাগ্যে ভরা একখানি মুখ। আর মনে পড়িত তাহার পায়ে কোমল দুখানি হাতের নিপুণ স্পর্শ। নিজের আকুলতা আর রাখিতে পারিত না, নিশিকান্তকে বলিত 'একটি গান গাও তো ভাই—'

এমনি সময়ে সে জ্বরে পড়িল। নিশিকান্ত তাহাকে কাজলের বাড়িতে লইয়া যাইতে চাহিল। শঙ্কর অনেক আপত্তি করিল, নিশিকান্ত শুনিল না, বলিল—'কতদিন কত

অসুখ বিসুখে নৌকাতে কাটাতে হবে, কাজলের বাড়ি কাছে থাকতে কেন এ কষ্ট পাওয়া।' তারপর শঙ্করকে গরুর গাড়িতে লইয়া, নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া সন্ধ্যার সময়ে কাজলের বাড়িতে উপস্থিত হইল।

কাজল সব শুনিয়া ক্ষিপ্র ও নিপুণ হস্তে খাটে শঙ্করের নূতন বিছানা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে নিজের বিছানা করিল। তারপর শঙ্করকে বাতাস দিতে বসিল। নিশিকান্তকেও থাকিতে বলিল, কিন্তু নৌকায় কাহারো থাকা দরকার বলিয়া নিশিকান্ত কিছুকাল পরে ফিরিয়া গেল।

দুদিন পরে শঙ্করের জ্বর ছাড়িল। যখনই চোখ মেলিয়াছে, দেখিয়াছে কাজল পাশে বসিয়া কিছু না কিছু করিতেছে। কখন যে সে নিজের কাজ করিত শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিত না। তেমনি পরিপাটি সাজানো ঘর, তেমনি পরিচ্ছন্ন বেশে কাজল।

সেদিন রাত্রিতে শঙ্কর কাজলকে কহিল—'তুমি আজ ঘুমোতে যাও, আমি তো ভালো আছি।'

কাজল উত্তর দিল—'আমি তো রোজই ঘুমোই সময়মতো। আজো তুমি দুর্ব্বল, আমি কাছে থাকি, তুমি ঘুমুলে আমি ঘুমুতে যাব।'

কিন্তু ঘুম শঙ্করের আসিল না। এ কি সত্য? যে ঘরের স্বপ্ন সে প্রতি সন্ধ্যায় দেখিয়াছে সেই ঘরে, সেই কাজলের কাছে সে রহিয়াছে, একি সম্ভব? সেই দীপালোকিত স্নিগ্ধ মুখখানি এত কাছে? রাত্রি হইলে

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—'কই তুমি ঘুমোচ্ছ না যে, বললে যে ভালো আছ?'

'এই যে এবার ঘুমোই'—বলিয়া শঙ্কর চোখ বুজিল। তন্দ্রাও আসিল। যখন জাগিল তখন কত রাত্রি জানে না। দেখিল কাজল তাহার মাথাটি কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর দুচোখ বহিয়া জল পড়িতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কাজল, কাঁদছ কেন?'

কাজল উত্তর দিল না, শঙ্কর আবার কহিল—'কী দুঃখ তোমার, কাজল? নিশিদা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।'

এবার কাজল উত্তর দিল, বলিল—'বাসে সত্যি, কিন্তু ও যেন ঝড়ের মতো এসেছে, আবার কবে ঝড়ের মতো চলে যাবে।'

শঙ্করের বুকের মধ্যে তোলপাড় বাধিয়া গেল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারপর কাজল হঠাৎ তাহার মুখখানা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'মাণিক আমার কেন আসোনি এতদিন, আমি যে রোজ পথ চেয়ে থাকতাম।'

শঙ্কর মনে মনে ডাকিল—'নিশিদা, নিশিদা।' ইচ্ছা হইল মুখ সরাইয়া লয়, কিন্তু পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কাজল আবার কহিল—'চলো, আমায় কোথাও নিয়ে চলো। চলো কাল রাত্তিরেই যাই। আমার কিছু টাকা আছে। যেদিন না থাকবে, ভিক্ষে করে তোমায় খাওয়াব, এমন করে ভেসে ভেসে আর পারি না।'

এবার শঙ্কর উঠিয়া বসিল। 'কী বলছ এসব তুমি?'

কাজল স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর আঁচলে চোখ ঢাকিয়া দ্রুত পদে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি অন্ধকার, যেন এই প্রত্যাখ্যাতা পথভ্রষ্টা নারীর লজ্জায়, অপমানে, কলঙ্কে চারিদিক কালি হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের ইচ্ছা হইল উঠিয়া যায়। কিন্তু উঠিয়া গিয়া কী বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। এক একবার মনে পড়িতে লাগিল নিশিকান্ত সেই সন্ধ্যাবেলাতেই না তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য অনেক মজার গল্প করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। কাজল নিজের কাজ ও রোগীর সেবা যেমন করিত, তেমনি করিতে লাগিল। কেহই রাত্রির কোনো কথা তুলিল না।

সেদিন বেলা হইলে নিশিকান্ত যখন আসিল, শঙ্কর তাহাকে বলিল সে ভালো হইয়া গিয়াছে। সেই দিনই ভাত খাইবে, এবং সেই দিনই নৌকায় ফিরিতে চায়। নিশিকান্তের ইচ্ছা ছিল শঙ্কর আর একদিন কাজলের কাছে থাকে। কিন্তু দেশে ফিরিবার আর দুই দিন মাত্র বাকি, তাই বিশেষ আপত্তি করিল না। সেও দ্বিপ্রহরে কাজলের কাছে খাইল। কিছু পরে শঙ্করকে বলিল—'তুই এবার এগো শঙ্কু, আস্তে হাঁটবি তো, আমি পথে ধরে নেব।'

এবার নিশিকান্তের যাইবার পালা। উঠিবার বেলায়

একখানা দশ টাকার নোট কাজলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল—'শঙ্কুকে রাখবার খরচপত্র—

সে শেষ না করিতেই কাজল নোট ফিরাইয়া দিয়া কহিল—'কোনো দরকার নেই, বিশেষ কিছু খরচ হয়নি।'

নিশিকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল—'এ কী কাজল বিবির টাকায় অরুচি হোলো কবে থেকে—

'রুচি অরুচি কী বোঝো তুমি? এবারে যাও তুমি, বন্ধু হয়তো অনেক পথ এগিয়ে গেল—'বলিয়া কাজল দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিশিকান্ত তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া গাহিল—"লোহারি বাঁধনে বেঁধেছ কাজল, দাসখৎ লিখে দিয়েছি হায়—"

তারপর একবার প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া নিজের পথ ধরিল। বিদায়ের বেলা কাজল কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু এবার ফিরিয়া দেখিল—কাজল সেখানে নাই। উচ্চৈস্বরে নিশিকান্ত কহিল—'সাবধানে থেকো, কাজল। পারি যদি তো বর্ষাকালে হয়ে যাব।'

শঙ্কর ও নিশিকান্ত দেশে ফিরিয়া কয়েক মাস কাটাইয়াছে। বর্ষা আসিবার আর বেশি দেরি নাই। দু'একটি প্রয়োজনীয় জিনিস আগে হইতেই কিনিয়া রাখিতে হইবে। এসব লইয়া পরামর্শ করিতে শঙ্করের বাড়িতে আসিয়া নিশিকান্ত দেখে শঙ্কর ঘরের মধ্যে মন দিয়া বই পড়িতেছে।

নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল 'কী বই ও ?'

শঙ্কর নিশিকান্তকে দেখিতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি বাইবেলখানি বন্ধ করিয়া বলিল—'ও একটা বই, কী মনে ক'রে, নিশিদা ?'

নিশিকান্ত সে কথার উত্তর দিল না, বলিল—'তুই বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসিস্, আচ্ছা 'বিদ্যাসুন্দর' আছে তোর কাছে ?'

'না, নিশিদা, কী মনে করে এলে ?'

নিশিকান্ত রাগের ভান দেখাইয়া বলিল—'তোর কাছে কি আসতেও নেই রে ? ফিরে অবধি তো ডুমুরের ফুল হয়েছিস। আর তো বেরোবার দেরি নেই আমাদের। তুই একটা জিনিস কিনতে টিনতে হবে, একদিন নীলগঞ্জে চল্।'

শঙ্কর কহিল—'নিশিদা আমি আর তোমার সাথে ফিরব না—কদিন থেকে মনে কর্ছি তোমায় বলব।'

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিয়া উত্তর দিল—'ফিরবি না কী রে ? তোর ভালো লাগে না ? আর এখানে করবিই বা কী ?'

শঙ্করের ভয় হইতেছিল নিশিকান্তের কাছে তাহার সঙ্কল্প না থাকে। তাই কিছু জোর দিয়াই বলিল—'ও কাজ আমি পেরে উঠব কিনা জানি না, তা ছাড়া আমার খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ও কিছু করা দরকার, দেশে না থাকলে এ সব হয় না।'

নিশিকান্ত কখনো কোথাও হার মানে নাই। শঙ্কর তাহাকে নিজে হইতে একেবারে ছাড়িবে এ তাহার কল্পনার অতীত। কিন্তু শঙ্করের কথায় যে দৃঢ়তা ছিল তাহা স্মরণে থাকায় বলিল—'তবে একটা বছর দেশে কাটা, টাকা কড়ি আদায় কর্। কিন্তু পারবি না কী, বেশ তো পারছিলি। পরের বৎসর আবার যাবি। এক বছরের জন্য একটা লোক আমি জোগাড় করে নেব এখন।'

তারপর অন্য অনেক কথা হইল। উঠিবার সময় নিশিকান্ত বলিল—'গানের অভ্যাসটা রাখিস, তোর বেশ গলা আছে।' ফিরিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে নিশিকান্ত শঙ্করকে গাহিতে শিখাইতেছিল।

নিশিকান্তের যাইবার দিন আসিল। তাহাকে বিদায় দিয়া ঘাট হইতে ফিরিবার সময়ে শঙ্করের মনে হইল যেন তাহার পৃথিবী শূন্য হইয়া গিয়াছে। মা, বাবা, কাজল, নিশিদা—একে একে সবাই কোথায় গেল। আঁধার রাত্রিতে নদীর বুকে দেখা নৌকার মতো এরা কোন্ আঁধারে মিলাইয়া গেল। সর্ব্বোপরি নিশিদা—

সে বেদনা বুঝিবার মতো লোক কি আছে সংসারে? সত্যিকার বন্ধু ইচ্ছা করিয়া বিদায় দিয়াছে কি কেহ? সে স্নেহে দান নাই প্রতিদান নাই, জয় নাই পরাজয় নাই, আহ্বান নাই প্রত্যাখ্যান নাই। এই অপরিচিত শত্রুময় জগতে দুটি পুরুষের এক সঙ্গে পথযাত্রা—শেষ কি হইয়া গেল সবই?

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। খত ফিরাইয়া দিবার পর যে কয়েকটি খাতক বাকি ছিল, শঙ্কর তাহাদের বাড়িতে যাইতে আরম্ভ করিল। বেশি দেনা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের। মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে দেখিয়া আদর আপ্যায়ন করিল এবং টাকার কথা তুলিতেই বলিল—'ও সম্বন্ধে উমেশ জানে। সে মাসখানেক পরে ফিরবে। মনে হয় যেন একবার বলেছিল যে প্রায় সমস্ত টাকাটা তোমার মাকে দেওয়া হয়েছে।'

শঙ্কর এখন এ সব কিছু কিছু বুঝিত, বলিল—'কিন্তু খতের পিঠে তো কোনো উশুল নেই।'

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া উত্তর দিল—'তোমরা বাবা একালের ছেলে, সব কাগজে কলমে চাই, আমরা পরস্পরকে কত বিশ্বাস করতাম। কতবার বিনা খতে তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা এনেছি, তারপর সুদশুদ্ধ ফেরৎ দিয়েছি, কিন্তু সেদিন কি আছে আর?'

শঙ্করের বেড়ানো হইতে লাগিল বটে—কিন্তু টাকা ঘরে আসিল না। সৃষ্টিধর এ সব জানিত তাই উচ্চ সুদে ছাড়া টাকা দিত না। তাহার কিছু লাভ হইয়া গেলেই বাকি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। কিন্তু এসব খত তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নেওয়া, সুদও তামাদি বাঁচাইবার জন্য দু-এক টাকা ছাড়া নেওয়া হয় নাই।

কয়েকদিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর দেখে তাহার জন্য রান্নাবান্না কিছুই হয় নাই। যে প্রতি-

বেশিনী তাহার জন্য রাঁধিয়া দিত, মনে করিল তাহার বুঝি অসুখ হইয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিল বুড়ী খাইয়া দাইয়া শুইয়া আছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কী মাসী ব্যাপার কী? মাসী কহিল—'সে অনেক কথা।'

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া বসিতে যাইতেছিল। বৃদ্ধা কহিল —'ঐখানেই দাঁড়াও, বাবা, আমি বাইরে আসছি।'

তারপর বাহিরে আসিয়া চুপি চুপি কহিল—'পাড়াময় রটে গেছে তুমি খেৃস্তান, গরু খাও, আচ্ছা বাবা একথা কি সত্যি?

সে কথার উত্তর না দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'রটেছে তো, কিন্তু রটাল কে, মাসী?"

তাহার প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা কিছু অপ্রসন্ন সুরেই উত্তর দিল—'কী জানি, বাবা, আমি কারো কোনো কথাতে নেই। মিথ্যে যদি হয়, পঞ্চায়েৎ করো।'

শঙ্করের গা জ্বলিতেছিল। বাড়িতে আসিয়া নিজেই রান্না করিল। পঞ্চায়েৎ ডাকিবার জন্য কোনো উৎসাহই প্রকাশ করিল না।

কিন্তু সমাজচ্যুত হইয়া গ্রামে বাস করা অত সহজ নয়। পাড়ায় বিবাহে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কেহ আর তাকে ডাকে না। কেহ কথা বলে না, কেহ বাড়িতে আসে না। কাহারো বাড়িতে গেলে যেন তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়ে। এমনি সময়ে একদিন অনেক রাত্রিতে মৃত্যুঞ্জয় তাহার সহিত দেখা

করিতে আসিল। শঙ্কর জাগিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। মৃত্যুঞ্জয়ের খতের তামাদির এক বৎসর এখনো বাকি। তাহার বড় ছেলে উমেশও ফেরে নাই, ফিরিলেও শঙ্কর তাহার দেখা পায় নাই। টাকাও কিছু সে পায় নাই।

শঙ্কর কহিল—'এত রাত্তিরে আপনি?'

মৃত্যুঞ্জয় চুপে চুপে কহিল—'চলো বাবা, তোমার ঘরের মধ্যে।'

তারপর ঘরে আসিয়া কহিল—'পাড়া না ঘুমুলে কি আসতে পারি—তবু না পথে হরিশের সাথে দেখা। বললাম, যুধিষ্ঠিরের মায়ের অসুখ দেখতে যাচ্ছি।'

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল, বলিল—'এত ভয় যখন, তখন এলেন কেন?'

মৃত্যুঞ্জয় কোনো উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, বলো বাবা, তুমি কি খ্রেস্তান?'

'না, আমি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইনি। কিন্তু খৃষ্টে আমি বিশ্বাস করি।'

'ঠাকুর দেবতা মানো?'

'যতদিন ধর্ম্মত্যাগ না করি, ততদিন দেশাচার, কুলাচার মেনে চলতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আমি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করি না।'

ইহাই যেন মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল, বলিল—'তবেই-তো, বাবা, তুমি খ্রেস্তান, এখন উপায় কী?'

শঙ্কর বলিল—'কিসের উপায়, আমি তো কারো কাছে থেকে কিছু চাইনি।'

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—'চাওনি ঠিক, কিন্তু এর পরে যে তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে না, তার মানে কী? কী রকম দিন কাল তো জানো। সৃষ্টিধরের ছেলে তুমি, তুমি ভুললে আমরা তো ভুলতে পারিনে। আমি বলি তুমি পঞ্চায়েৎ ডাকো। সেখানে আমার কথার উপর কথা কইবে এমন সাহস কারো নেই। তারপর একটা যা কিছু প্রাশ্চিত্তির করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি থাকলে তোমায় মারে কে?'

শঙ্কর তেমনি ধীরস্বরে কহিল—'আমি পঞ্চায়েৎও ডাকব না, প্রায়শ্চিত্তও করব না, আপনাদের ভয় নেই, এদেশ আমি ছেড়ে যাব।'

মৃত্যুঞ্জয় এতটা ভাবিতে পারে নাই। বলিল—'তবে উঠি, কিন্তু কথাগুলি ভেবে দেখো, বাবা।'

শঙ্কর কহিল—'দাঁড়ান একটু।' তারপর একটি কাঠের বাক্স খুলিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের খতখানি বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়া বলিল,—'এইটি নিয়ে যান।'

মৃত্যুঞ্জয়ের ইহাতে যেন বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না, বলিল—'ও সেই খতখানা, তা দাও, বাবা, এত তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, তা দেখো, প্রাশ্চিত্তির না করলেও চলতে পারে।'

শঙ্করের আর সহিতে ছিল না, বলিল—'এবার যান, আমি শুতে যাব। তবে আপনাকে বলে রাখি যে খৃষ্টান যে

হইনি তার একমাত্র কারণ আমার মার তাতে অমত ছিল এবং সেইজন্য হবও না কোনোদিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খৃষ্ট-ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম।'

শেষের কথাগুলি শঙ্কর উত্তেজনাবশেই বলিয়াছিল। ইদানীং মনের শান্তির জন্য সে অনেক সময়েই বাইবেল পড়িত বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে বাস্তবিক সে অতদূর অগ্রসর হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেলে তাহার মনে আসিল উত্তেজনার পরিবর্ত্তে গভীর নৈরাশ্য। মনে পড়িতেছিল যে সে একদিন ভাবিয়াছিল ইহাদের জাগাইবে, ইহাদের সমবেত শক্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া যাহারা যুগান্তের অত্যাচার, ঘৃণা ও স্পর্দ্ধার উপর আসন মেলিয়া আজ এত উপরে উঠিয়াছে, তাহাদের টানিয়া আনিয়া ধূলায় লুটাইয়া দিবে। কিন্তু ভদ্রলোকের অত্যাচারের মূলে তবু যাহোক একটা বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনার জন এরা, এদের মনও কি ভগবান সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন।

সারারাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। এক একবার মনে হইল যেন জ্বর আসিয়াছে। দু-একবার বাতি জ্বালাইয়া বাইবেল পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো শান্তি মনে আসিল না, শেষ রাত্রিতে এক একবার একটু তন্দ্রা আসিল। জাগিয়া দেখে ভোর হইয়াছে। বাহিরের প্রভাতের বায়ুর স্পর্শ যেন স্বপ্নলব্ধ কাজলের চুম্বনের মতো স্নিগ্ধ। দেহমন জুড়াইয়া গেল। সহসা মনে হইল সে খৃষ্টকে জীবনে পায় নাই, তাহার কারণ খৃষ্টকে সে চাহে নাই। চাহিয়াছে

স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, অত্যাচার হইতে মুক্তি। কাজলকে সে যে রাত্রির আঁধারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সেই কাজল তো সকাল সন্ধ্যা তাহার বুকের মধ্যে। আর যিনি চিরদিন সাথে রহিয়াছেন, এ আশ্বাস দিতে পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই খৃষ্ট, তিনিই দূরে রহিবেন—ইহার কারণ তাহার নিজের ব্যাকুলতার অভাব ছাড়া আর কিছু হইতে পারে ?

সেদিন অপরাহ্ণে শঙ্কর নীলগঞ্জে গিয়া একখানি ছোট নৌকা কিনিল। একজনে চালাইতে পারে। সেটা নিজেদের ঘাটে বাহিয়া আনিয়া যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি। নিজের উপযোগী বিছানা ও তৈজসপত্র কিছু নৌকাতে সেই রাত্রিতেই উঠাইয়া রাখিল। পরদিন ভোরে বাড়িতে তালা দিয়া চাবি লইয়া সেই বৃদ্ধার কাছে আবার গেল।

বৃদ্ধা উঠানে গোবরের ছড়া দিতেছিল। শঙ্কর কহিল—'এই যে মাসী, তোমারও যে খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। আমি কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। বাড়ির চাবিটা তোমার কাছে রইল। কিছু ভয় কোরো না, এবার দেখো আর কেউ কিছু তোমাকে বলবে না।'

বৃদ্ধা চাবি লইল, বলিল—'কোথায় যাচ্ছ ?' শঙ্কর হাসিয়া কহিল—'জানি না।' 'কবে আসবে ?' 'তাও জানি না।'

তারপর 'এবার আসি মাসী'—বলিয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া শঙ্কর ঘাটে আসিল। সেখানে গাড়ু হাতে দুইটি

পাড়ার বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল, শঙ্করকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বাতাস ছিল। শঙ্কর ছোট একখানি রঙীন পালও কিনিয়াছিল। তাহাই খাটাইয়া দিল। নৌকা ছুটিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ দুটি মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। তারপর শুনিল শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছে—

'ও মন তোর ভাবনা কী ?
খৃষ্ট তোর রথের সারথি।'

এবার একজন আর একজনকে কহিল—'ব'লেই তো ছিলাম, মৃত্যুঞ্জয় মিথ্যা বলবার লোক নয়।'

পিঞ্জরে

শ্যামনগর পরগণাতে আমাদের চন্দ্রদহ নামে একটি বিল ছিল। শীতকালে সেখানে প্রচুর শিকার মিলিত। পাখী শিকারে বীরত্বের কোনো প্রয়োজনই নাই, আর চন্দ্রদহের এমনি গুণ ছিল সেখানে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকারও প্রয়োজন ছিল না। ভোরের বেলায় ঠিক সময়ে যাইতে পারিলেই হইত, তারপর চোখ বোজা আর গুলিছাড়া। কিন্তু যত গোলমাল ঐ ঠিক সময়ে যাওয়া। আমাদের গ্রাম হইতে বিলটি প্রায় মাইল কুড়ি হইবে। রাস্তা একরূপ নাই বলিলেই চলে। বিল হইতে তিন মাইল দূরে আমাদের একটি তহশীল কাছারী ছিল। আগের সন্ধ্যায় গিয়া সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া যাওয়া ছিল সবচেয়ে আরামজনক পন্থা। শীতকালে প্রায়ই আমার ২।১ জন শিকারলোভী বন্ধু কলিকাতা হইতে আসিতেন। সেবার বড়দিনের ছুটী হয় হয়, এমন সময়ে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন নাগরিক জীবনের পেষণে তাহার পৌরুষ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এবার পাখী মারিয়া লুপ্তশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে চান। যথা সময়ে তাহার আগমন হইল। ২।১ দিন আমাদের বাড়িতে থাকিবার পর শিকারে যাইবার বন্দোবস্ত

হইল। যেখানে আমাদের তহশীল কাছারী সে গ্রামের নাম নাগর। নাম যাহারা রাখিয়াছিল তাহাদের রুচি যেমনই হোক্ গ্রামের নাম শীঘ্র বদ্‌লানো যায় না। যখন কাছারীতে পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শুক্লাষ্টমীর জ্যোৎস্না শীতের কুয়াশায় ম্লান।

খাবার সঙ্গেই ছিল। দুই বন্ধুতে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া যখন বারান্দায় বসিলাম তখন মনে হইল যেন লোক-সমাজ ছাড়িয়া পৃথক জগতে আসিয়াছি। কাছারীতে কোনো কর্ম্মচারী তখন ছিল না। সর্ব্ব নিকটের গ্রাম প্রায় ১মাইল দূরে। থাকিয়া থাকিয়া দু একটি অজানা নৈশ পাখীর ডাক আর দূরাগত শৃগালের কণ্ঠধ্বনি।

বন্ধুর আমার দুইটি ব্যবসা ছিল ব্যারিষ্টারী ও কবিত্ব। প্রথমটি ছিল ধনাগমের ব্যবসা। দ্বিতীয়টি ধনক্ষয়ের। কারণ তাহার কবিতা কখনো বিক্রয় হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন আজি হতে শতবর্ষ পরে কেউ হয়তো বুঝবে। খরচের কথা বলিলে বলিতেন যাইহোক্, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বিয়েতে নিজের বই দিলে দেখায়ও ভালো, খরচও বাঁচে। বন্ধুর অর্থনীতির সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মত বদলায় নাই। যাই হোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অত্যাচার সহ্য করিলাম। যখন আলো নিভাইয়া ঘরে আসিলাম তখন অষ্টমীর চাঁদ অস্ত গেছে। বন্ধুর শিকারে উৎসাহ যতটা ছিল, সকালে উঠিবার অভ্যাসটি তত ছিল না, উঠিতে দেরিই হইল। তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া

বাহির হইয়া পড়া গেল। শীঘ্রই পরের গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

ছোটগ্রামের পথ। দুপাশে গৃহস্থের বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িটা শুকনা সুপারি পাতার বেড়া দেওয়া। তখনো রোদ ওঠে নাই। বন্ধু আর আমি বেশ জোর গলাতেই কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় পাশের বাড়ির বেড়ার পাশ হইতে একটি ছোট ছেলে আসিয়া বলিল, বৌদি আপনাকে ডাকছেন।

কার বৌদি কা'কে ডাকে এই অচেনা গ্রামে, তবু অনেকটা না ভাবিয়াই সেই বাড়ির ভিতর ঢুকিলাম, বন্ধু পথেই রহিলেন। ঢুকিয়াই বুঝিলাম যে পথ দিয়া ঢুকিয়াছি সেটি অন্দর মহলের পথে। রহস্য ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ছেলেটি আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া গেল। তার স্থানে যিনি আসিলেন তাঁহাকে আগে দেখিতে পারি নাই, কারণ আধহাত ঘোমটা দেওয়া ছিল। যে স্থানটিতে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম সেটি কুয়ার কাছে। কাছেই একটি কাগজির গাছ। ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সত্যি গোময়ের লেপা ঝকমক করিতেছে। বাড়িতে তখনো বেশি কেহ উঠে নাই। কাছে আসিয়াই মেয়েটি ঘোমটা কমাইয়া দিল, তারপর অনুচ্চস্বরে কহিল—আমাকে চিনতে পারেন। এবার আমার সত্যই মনে হইল যে ঘুম আমার ভাঙ্গে নাই, এখনো কাছারীতে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। কী উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় মেয়েটি নিজেই কহিল, আমি কমলিনী, আপনাদের

গ্রামের জানকী বোসের মেয়ে। যৌবনের অনেক বেদনা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি। কিন্তু ইহার প্রভাবে কুমি যে কমলিনী হয় তাহা আমার জানা ছিল না। সেই কুমি যে আমাদের পাঠশালাতে পড়িত, যাহাকে হাতে ধরিয়া কত তালপাতা লেখাইয়া দিয়াছি, সে এত বড় হইয়াছে।

যাহারা ছোট ছিল, তাহাদের বড় দেখিলে নিজের বয়সের কথা যত মনে পড়ে এত আর কিছুতেই নয়। যাই হোক ভাবিবার সময় ছিল না, বলিলাম—তোমার এখানে বিয়ে হয়েছে? সে উত্তর দিল হ্যাঁ, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাপের বাড়ির কোনো খবর জানেন। আমাকে স্বীকার করিতে হইল জানি না, পথে কমলিনীর সাথে দেখা হইবে জানিলে হয়তো বা জানিয়া আসিতাম। সে আবার বলিল—আজ কতদিন চিঠি পাই না, ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছি, মা উত্তর দেননি। আজ ক'দিন থেকে মন যে কেমন কচ্ছে কী বলব। ভোর বেলায়, উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার গলা শুনে, মনে হল, আমাদের দেশের মানুষের গলা, তারপর বেড়া ফাঁক করে দেখে আমার ছোট দেওরটিকে দিয়ে ডেকে পাঠালাম। তারপর আমার উত্তর দেবার অপেক্ষা না করিয়া বলিল—আমার একটা কথা রাখবেন। ফিরে গিয়ে আমাকে একটা খবর দেবেন তারা কেমন আছেন, কী যে করে মনে কী করে বল্‌ব। পাখীগুলো যখন উড়তে থাকে মনে হয় যদি পাখী হতাম তবে একবার গিয়ে দেখে আসতাম। এবার যান, আমার শাশুড়ী এখুনি উঠে পড়বেন। বলিয়াই আবার

যে দিক দিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। সে ছোট ছেলেটির আর দেখা পাইলাম না, নিজেই বাহির হইলাম।

বন্ধুর প্রাণ একলা গ্রামের পথে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহির হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হে Romance! আমি বলিলাম না মোটেই নয়। বন্ধু হাসিয়া কহিলেন— সে কী, অচেনা গ্রামের পথে যুবতীর আহ্বান, এও যদি Romance না হয়—আমি বলিলাম, যুবতী কী করে জানলে —বুড়ীদেরও তো দেওর থাকে!

বন্ধু কহিলেন তোমার ভাগ্যে আমি হিংসা কচ্ছি না, কিন্তু এত ছোট ছেলের যদি বুড়ী বৌদি থাকে তবে দুর্ভাগ্য তোমার আর ছেলেটির। আমি উত্তর দিলাম—না তা নয়, ধরেছ ঠিক যুবতীই বটে, তবে প্রেমের আহ্বান নয়। চাই কী বেরুতে দেরি হলে শাশুড়ী ঠাকুরুণের সম্মার্জ্জনীর সাথে সাক্ষাৎ হত হয়তো। শিকার সেদিন জমিল না, বন্ধু কহিলেন রমণীর নয়নবাণ না কি পুরুষগুলিকে অমনি অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। আমি শুধু ভাবিতেছিলাম কী পিঞ্জরের পাখী এরা। মাত্র কুড়ি মাইল দূরে বাপের বাড়ি তবু ঘরের বৌ, কাহাকেও সন্ধান নিতে বলিতে সাহস করে না। শুধু এই রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরের দ্বারে গৃহ-ব্যাকুল মন আঘাত পায়। অথচ শুধু বাপের বাড়ির দেশের লোক বলিয়া একটি প্রায় অপরিচিত লোককে ডাকিতে ইতঃস্তত করে না। তাহার উপর খানিকটা দাবীও রাখে। ফিরিয়াই একটি পিয়াদা

দিয়া তাহার পিত্রালয়ের খবর তাহাকে দিয়াছিলাম। তারপর যতদিনই কোনো গ্রামের পথে গিয়াছি, শুধু মনে হইয়াছে কত কোমল প্রাণ এই সব গৃহ প্রাচীরের ভিতরে অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় ভরিয়া হাস্যমুখে সংসারের কাজ করিতেছে।

হাতের কাজ কিছু কমিলে একদিন জানকী বোসের বাড়িতে গেলাম। তিনি আমাদেরই প্রজা। বাড়িতে ছিলেন না। গৃহিণী আমার সাথে দেখা করিতে আসিলেন। আর দেখা করিল তাহার একটি ছেলে কমলিনীরই ২।১ বৎসরের ছোট হইবে।

গৃহিণী বৈবাহিকের বিশেষতঃ বৈবাহিকার অনেক নিন্দা করিলেন, বলিলেন গত পূজাতে আনিতে চাওয়া সত্ত্বেও তাহারা কমলিনীকে পাঠান নাই। পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও কমলিনীর ভাই, অর্থাৎ তাহার ছেলে কমলিনীর নিকট চিঠি লিখিয়া দেয় নাই।

কমলিনীর স্বামী রেলে চাকুরী করে। স্ত্রীকে সঙ্গে লইবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু মায়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারে না ইত্যাদি। তারপর আমাকে অনেক মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া আমার পদার্পণে কৃতার্থ হইয়াছেন জানাইয়া বিদায় দিলেন। চলিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় ছেলেটিকে বলিলেন—তোর দাদাবাবুকে প্রণাম কর্। ছেলেটি প্রণাম করিল।

তারপর প্রায় একমাস গিয়াছে। বহু সময়ে কমলিনীর

সেই ব্যথিত মুখ আমার মনে পড়িত কিন্তু আমি শুধু তাহার কথা ভাবিতাম না। তাহার কথা ভাবিতে গেলে মা ছাড়া অল্পবয়সের যত মেয়ে যেখানে শ্বশুর ঘর করিতেছে তাহাদের কথা মনে পড়িত। কেহ কেহ বলেন এই অল্পবয়সে স্বামীর ঘর করিতে করিতে সে ঘর আপন হইয়া যায়। পাকা ডালে কলম বাধে না। এবং সেইজন্য বেশি বয়সের মেয়েরা পুত্র-বধূরূপে সংসারের সকলের সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পারে না, গৃহবিবাদ হয়, একান্নবর্ত্তী সংসার ভাঙ্গে। হইতে পারে একথা সত্য। সমাজতত্ত্ব আমি আলোচনা করি নাই। কিন্তু যখনই ভাবিতাম অবরুদ্ধ অন্তঃপুরে আত্মীয়হীন স্নেহহীন জীবন কমলিনীর মতো মেয়ের পক্ষে কী দুঃসহ তখনই মনে হইত, হয়তো অন্য উপায় আছে, যাহাতে ঘরও ভাঙ্গে না, আর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এমন ব্যথায় তিক্ত হইয়া ওঠে না।

কী যে উপায় ভাবিতে পারি নাই। জানকীবাবুর বাড়ি হইতে প্রায় একমাস হইল আসিয়াছি, একদিন সকালে নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, হঠাৎ একটি ছেলে আসিয়া প্রণাম করিল। বলিলাম—তোমরা ভালো আছ, তোমার দিদি ভালো আছেন।

ছেলেটি কহিল, হ্যাঁ—

আর দু একটি অসংলগ্ন প্রশ্ন ও উত্তর হইল। কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই ওঠে না। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি কোনো কাজ আছে আমার সাথে? তবুও কথা কহে না, তারপর পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে বলিল—আজ্ঞে, মা বলছিলেন

যে জেলার সাহেবের সাথে আপনার জানাশুনা আছে, আপনি যদি তাদের ব'লে আমার একটি চাকরী করে দেন।

হায়রে কোথায় কমলিনী, আর কোথায় তার মা-হারানোর ব্যথা। না জানিয়া এ ছেলেটি আমার কী করিল। সারারাত্রি প্রেমাভিনয়ের পরে প্রত্যূষে যখন বারাঙ্গণা তার প্রাপ্য চায় তখন বোধ হয় প্রমত্ত যুবক এমনি ভাবে জাগে। বলিলাম—তোমার মাকে বোলো তাদের কারো সাথে আমার আলাপ নাই। আর তা ছাড়া আমি স্বদেশীর দলে। আমি বলিলে তোমার চাকরীর যেটুকু সম্ভাবনা আছে তাও যাবে।

কমলিনীর কথা আর ভাবিতে পারি নাই।

অমল

দ্বিপ্রহরে অমলকে ঘুম পাড়ানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অথচ সমস্ত দিনরাতের মধ্যে অমলের মায়ের এই সময়টিতেই সবচেয়ে নিদ্রাকর্ষণ হইত। সেদিন দুপুরে শীতলপাটী বিছাইয়া অমলকে লইয়া তিনি শুইয়াছিলেন। একটা খোলা জানলা দিয়া মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়া বাহিরের রৌদ্রের প্রতাপ জানাইতেছিল।

পাশে শুইয়া অমল উসখুস করিতেছিল—মনে তার অজস্র প্রশ্ন জমা হইয়া আছে। বৌদির কাছে গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষাটাও মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমাগতঃ তার হাত পা নাড়ানোতে মায়ের ঈষৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি কহিলেন—অমল তুই ঘুমুবি, না, না ?

অমল নিরপরাধের মতো সরল কণ্ঠে উত্তর দিল—কেন, মা, আমি তো চুপ করে শুয়ে আছি।

‘ওকে যদি চুপ করে শুয়ে থাকা বলে, তবে গোলমাল করা কাকে বলে ? ঘুমো দেখিনি তুই একটু, আমি একটু চোখ বুজি।’

খানিক্ষণ চুপ করিবার চেষ্টা করিয়া অমল কহিল, ‘মা।’

‘কেন।’

আচ্ছা, মা আমি কোথা থেকে এলাম।

কেন, ঐ কমলালেবুর গাছটা থেকে।

কোন কমলালেবুর গাছ থেকে।

প্রথম উত্তর দিবার সময় মা কিছু ভাবিয়া বলেন নাই। কিন্তু অমলের জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি একবার জাগিলে তাঁহার আর ঘুমের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তিনি কিছু গুছাইয়া কহিলেন,—

'ঐ যে বাড়ির পিছনে কুয়াটার পাশে কমলা গাছ, ওর দুটো বড় ডাল দেখেছিস, ওরই মাঝে একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি তুই শুয়ে কাঁদছিস্ পেড়ে নিয়ে এলাম—এবার, আর একটা কথাও না। তোর যন্ত্রণায় যদি আমি কোনোদিন একটু ঘুমুতে পারি।'

জননী চোখ বুজিয়াই কথা বলিতেছিলেন পাছে ঘুমের রেশটা ভাঙ্গে। এবার একটু চোখ মেলিতেই দেখিলেন, অমল দরজার কাছে। রুক্ষস্বরে কহিলেন 'কোথায় যাচ্ছিস্।'

'বড়মার কাছে' বলিয়া অমল দরজা খুলিল।

ব্যস্ত হইয়া মা কহিলেন, 'লক্ষ্মীটি তবে সে ঘরেই থাকিস, রোদে ঘুরিস না যেন।'—'আচ্ছা মা,' বলিয়া অমল বাহির হইয়া গেল। একটু শান্তি পাইয়া মা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২

বস্তুতঃ এই কমলালেবুর গাছের গল্প শুনিয়া অবধি অমলের মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু

মায়ের স্বভাব সে জানিত, আপাততঃ তাঁর নিকট হইতে আর খবরের আশা নাই, নিজের ঘুম নষ্ট করিয়া তিনি তাহাকে গল্প বলিবেন না জানিয়া অমল তার জ্যেঠাইমার কাছে যাইবার সঙ্কল্প হঠাৎ করিয়াছিল। জ্যেঠাইমাকে বড়মা বলিত। তিনি দিনে ঘুমান না, সে জানিত।

বাহিরে বৈশাখের রৌদ্র। মায়ের কাছে কথা দেওয়া সত্ত্বেও আস্তে আস্তে অমল কমলালেবু গাছটার কাছে গেল। কতদিন এ গাছের পাশ দিয়া গিয়াছে, ইহার মূলে বসিয়া সাথীদের সাথে খেলিয়াছে, কিন্তু গাছটিকে এত রহস্যের আধার বলিয়া ভাবে নাই। আজ সেখানে আসিয়া ডাল দুটি সে ভালো ভাবে দেখিল। এইখানে সে ছিল—কিন্তু তার কৌতূহলের উদ্রেক মাত্র হইয়াছে কে আনিয়াছিল, সে তখন কতটুকু ছিল ইত্যাদি।

খানিক্ষণ দাঁড়াইয়া সে বড়মার ঘরে গেল। তিনি তখন চশমা আঁটিয়া রামায়ণ পড়িতেছিলেন, আর সীতার বনবাস দুঃখে তাঁর চোখ ভিজিয়া উঠিতেছিল। অমল ঢুকিতেই কহিলেন—কী অমল।

যে প্রশ্ন মুখে করিয়া আসিয়াছিল, বৃহদাকার পুঁথি দেখিয়া অমল তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল—'বড়মা ওটা কী পড়ছ বড়মা।'

'রামায়ণ।'

'ছবি আছে।'

'না বাবা।' সত্যিই বটতলার পুঁথি, কোনো ছবি ছিল না।

খানিক্ষণ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমল কহিল—আচ্ছা, বড়মা, তুমি সেখানে ছিলে ?

বিস্মিত হইয়া তিনি কহিলেন—কোথায় ?

অমল কহিল, কেন যেদিন আমাকে কমলা গাছ থেকে পেড়ে নিয়েছিল মা।

বড়মা অতি সরলপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কহিলেন 'সে আরার কবে।' অমল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। জন্মিয়া অবধি বড়মাকে দেখিতেছে—এত বড় একটা ঘটনাতে তিনি থাকিবেন না, ভাবিতেই পারিল না, বলিল—

আচ্ছা, আমি কোথা থেকে এলাম ?

এ সম্বন্ধে বড়মার একটি গল্প বাঁধা ছিল। তাঁর নিজের ছেলেদের শিশু অবস্থায় অনেকবার বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—কেন নদীর স্রোতে।

'কোন নদী ?'

'এখানে আর নদী ক'টা রে। সে অনেকদিনের কথা, চৈত্রসংক্রান্তিতে নদীতে নাইতে গেছলাম। স্নান করছি এমন সময় দেখি একটা পদ্ম ফুল ভেসে যাচ্ছে, তার মধ্যে ছোট একটা ছেলে কাঁদ্ছে। সেটাকে ধ'রে তা থেকে ছেলেটিকে তুলে নিলাম, সেই যে তুই আমার',—বলিয়া অমলকে চুম্বন করিলেন। অমল খুসী হইল না। বস্তুতঃ তার মনে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। এ দুয়ের কোন গল্পটি সত্য তাই জিজ্ঞাসা করিল—'তবে যে মা বলল, কূয়ার পাড়ের

কমলাগাছের ডালের মধ্যে আমি ছিলাম, সেখান থেকে পেড়ে নিয়েছিল।'

এতক্ষণে বড়মা বুঝিলেন যে একথাটি তার কাছে হইয়া গেছে। তিনি কহিলেন, 'না অমল, তোর মার ভুল হয়েছে, কমলাগাছে পাওয়া গেছল কমলাকে, তোর দিদি, তাই তো তার নাম কমলা, তোর মা ভুল করেছে—'

'আচ্ছা বড়মা, তুমি পড়ো, আমি বৌদির কাছে যাই,'—বলিয়া অমল ভিতরের দালান দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া বড়মা উচ্চস্বরে কহিলেন—'ওরে বাইরে রোদে যাস্‌নি যেন,' সে কথা কানে না পৌঁছতেই প্রবল-বাত্যার মতো বৌদির শয়নকক্ষে অমল ঢুকিল।

৩

গৃহকর্ম্মান্তে নিরালা দুপুরটিতে বৌদি প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখিতেছিলেন। ঘরের পাশে লিচুগাছে ক্লান্ত-কপোতের স্বর, দূর আম্রবন হইতে ঘুঘুর করুণ ডাক বোধহয় তাঁর বিরহী হৃদয়কে উতলা করিয়া তুলিতেছিল—অমল ঢুকিতেই যেন তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। তবু তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া রাগ করিতেও পারিলেন না। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন—এই শিশু দেবরটি তাঁর হৃদয়ের একটি অপূর্ণ কথা ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেটা খানিকটা ছোট ভাইয়ের খানিকটা সন্তানের। তা ছাড়া

তার মুখ চোখ, বলিবার ভঙ্গী, হাসিবার ধরণ, সবি তাঁর স্বামীকে মনে করাইয়া দিত। কতদিন অবসন্ন হৃদয়ে এই শিশুটিকে বুকে লইয়া প্রাণ জুড়াইতে চেষ্টা করিতেন। অমলও তাহাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, মাকে সে কিছু ভয় করিয়াই চলিত। বড়মা চিরদিনই কিছু আনমনা। তার কত আবদার, গোপন কথা, সব ছিল বৌদির কাছে কিন্তু সব চেয়ে ভালোবাসিত সে—বৌদির মুখে উপকথা শুনিতে। তাই ঘরের কাজ শেষ করিয়াও তার এই দেওরের কাজ ফুরাইত না।

কী লিখ্ছ বৌদি,—বলিয়া অমল ঝুঁকিয়া চিঠি দেখিতে লাগিল। সবে দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াছে। বৌদিকে কিছু বিদ্যা জানানো চাই তাই তারস্বরে চিঠির যেখানটায় চোখ পড়িল সেইখানটা বানান করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—"আমি ব্য বয়ে যফলা থা আকার ব্যথা পাইলে—বৌদি ব্যথা কিসের?" বৌদি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—যা তোমার যেন না পেতে হয়, লক্ষ্মী ভাইটি অত চেঁচিয়ে পোড়ো না।—"চিঠি তুমি পরে লিখো বৌদি। আমায় একটা কথা বলো," বলিয়া অমল অতি কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। "আচ্ছা সত্যি করে বলো দেখি আমি কোথা থেকে এলাম, নদীর জলে, না কমলার গাছ থেকে?" এই "সত্যি ক'রে" শুনিয়া চতুর বৌদি বুঝিলেন যে কোথাও কিছু গোলমাল হইয়াছে। তাই একটু একটু করিয়া সকল কথা অমলের কাছ থেকে শুনিয়া হাসি চাপিয়া বলিলেন,—অমল, মা বড়মা

দুজনের কথাই সত্যি। বড়মা নদী থেকে তুলে আমার কাছে দেন, আমি মজা করবার জন্য কমলাগাছে তুলে রাখি।

তুমি অত উঁচুতে উঠলে কী করে?

কথাটা তার মনেই হয় নাই। কিন্তু তার বুদ্ধি সহজে খেলিত, বলিলেন—কমলাগাছ কি তখন অত বড় ছিল? —সে আজ সাত বৎসরের কথা। তখন ওখানটা আমি হাতে পেতাম।

সমস্ত ব্যাপারটা অমলের কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। সহসা গাল ফুলাইয়া কহিল—'একটি গল্প বলো না বৌদি।' বৌদি এই ভয়টিই করিতেছিলেন। অমলের ফরমাস একবার আরম্ভ করিলে শীঘ্র শেষ হইবে না। কঙ্কাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া, মধুমালা সাত ভাই চম্পা, একে একে সকল গল্পই বলিতে হইবে, অথচ চিঠিটা আজ না দিলেই নয়। তাই মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন—লক্ষ্মী ধন আমার, একটু চুপ ক'রে শোও, আমি চিঠিটা শেষ করি তারপরে বলব—

চিঠি তুমি পরে লিখো, আগে গল্প বলো, একটা শুধু।

আর বাদ প্রতিবাদ বৃথা জানিয়া, বৌদি কহিলেন,—আচ্ছা বলছি, কিন্তু একটা কথা, একটির বেশি নয় আর তুমি চুপ ক'রে আমার পাশে চোখ বুজে শোবে, আর বলতে পারবে না, "তারপরে"। মহোৎসাহে অমল বলিল—আচ্ছা।

চেয়ার ছাড়িয়া বৌদি বিছানায় আসিলেন, অমল পাশে

শুইল। বৌদির আশা ছিল যে চুপ করাইয়া রাখিতে পারিলে গল্প বলিতে বলিতে অমল ঘুমাইয়া পড়িবে, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া চিঠিটি শেষ করিতে পারিবেন। অমলের ছোট হাতটি নিজের হাতে লইয়া কহিলেন, 'বলো কোনটি বলব।'

বৌদিকে খুসী করিবার জন্য অমল কহিল—'তোমার যেটা ইচ্ছে সেটা।'

৪

বৌদি গল্প আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বলিয়া থামিয়া পরখ করিতেছিলেন অমল ঘুমাইয়াছে কিনা। একটু থামাতেই অমল বলিল "তারপর"। বৌদি কহিলেন—আমি আর বলব না, কী কথা ছিল অমল। তুমি চোখ মেলবে না, বলবে না 'তারপরে—'

অমল অনুযোগের স্বরে বলিল—তুমি থামলে কেন, রাজকন্যা কী করলে তখন?

আচ্ছা—বলিয়া বৌদি গল্প আবার আরম্ভ করিলেন। মিনিট দশেক বলিয়া একটু থামিলেন—অমল এবার চোখ না মেলিয়াই কহিল—হুঁ।

এবার বৌদি রাগের স্বরে কহিলেন—আচ্ছা, এবার কেন হুঁ বললে? আমি পাশ ফিরছিলাম বই তো নয়।

অমল হাসিয়া বৌদির গলা জড়াইয়া কহিল—বলা বারণ ছিল "তারপরে", আমি তো খালি হুঁ বলেছি।

'দুষ্টু ছেলে কথা কইতে পাবে না,'—বলিয়া তার গাল দুটি টিপিয়া বৌদি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, শ্বশুরের উঠিবার সময় প্রায় হইল। এক্ষুনি মিছরির জল দিতে যাইতে হইবে, চিঠি লেখা বুঝি হয় না অথচ আর একজন হয়তো এই চিঠির পথ চাহিয়া আছে। হঠাৎ কী মনে করিয়া তিনি বলিলেন—'অমল, এ সব তো পুরাণো গল্প, একটা নূতন শুনবে?' পরম-পুলকভরে অমল কহিল, 'হাঁ বৌদি।'

'তবে শোনো—একদেশে এক রাজা ছিলেন তিনি থাকতেন বিদেশে, রাণী থাকতেন বাড়িতে, রাণীর সাথে ছিল রাজার ছোট ভাইটি—সে তার রাণীবৌদিকে খুব ভালোবাসত। রাণীও তাকে বড় ভালোবাসতেন।'

অমলের মনে কী সন্দেহ আসিল, সে কহিল, 'সে কি আমি বৌদি?'

না, তুমি হতে যাবে কেন? আমরা কি রাজা, আর সে ছোট কুমারের নাম ছিল সরলকুমার, তোমার নাম তো অমল।

ছোটকুমার কে?

ঐ সে রাজার ভাই।

এইরূপে ছোটখাট প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বৌদি গল্প বলিয়া গেলেন।

'রাজা থাকতেন অনেক দূরে। রাণীর জন্য ছোট কুমারের

জন্য তাঁর মন কেমন করত। আর রাণীও রাজা একলা দূরে থাকতেন বলে অনেক ভাবতেন। প্রতিমাসে একবার করে রাণী রাজাকে চিঠি দিতেন—অনেক দূর কিনা, চিঠি পৌঁছতে দেরি হত।

সরলকুমার সারাদিন রাণীর কাছেই থাকত। আবদার করত, ভালোবাসত, চুমো খেত আর গল্প শুনত। রাণীর রাজবাড়ির অনেক কাজ—সেরে এসে বসলেই ছোটকুমার তার কোলটি জুড়ে বসত।

একদিন সে গল্প শুনবার লোভে রাণীকে চিঠি লিখতে দিল না। সে মাসে রাণীর চিঠি গেল না। রাজাও চিঠি না পেয়ে ভাবলেন যে রাণী বাপের বাড়িতে গেছেন তাই লিখলেন না। এরি মধ্যে রাজা যে দেশে ছিলেন সে দেশ ছেড়ে আর এক দেশে গেলেন।

রাণী ঠিকানা জানতে পারলেন না, চিঠি লিখতে পারলেন না। খবর না পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। এ সময়ে শুধু সরলকুমারকে বুকে নিয়ে তিনি প্রাণ জুড়োতে চাইতেন।

সরলকুমার কিছু বুঝত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাণীর শরীর খারাপ হতে লাগল। তারপর একদিন কবিরাজ বলল, শক্ত অসুখ।

কত চিকিৎসা হল। কিন্তু রাণীর মনও ভালো ছিল না, শরীরও সারল না। তারপরে একদিন সকলকে রেখে, তার স্নেহের সরলকে পরের হাতে দিয়ে তিনি মরে গেলেন।

এমনি দুষ্টু সরল, যে তার আদরের রাণী-বৌদির জন্য একটুও কাঁদল না।'

হায়রে শিশুর কোমল মন, অমলের চোখের পাতা তখন সবে ভিজিয়া উঠিয়াছে। সে গম্ভীর হইয়া কহিল, 'বৌদি তুমি চিঠি লেখো, আমি ঘুমোই।'

'ঘুমোও ধন,' বলিয়া নিজের প্রতারণায় ঈষৎ ব্যথা পাইয়া তিনি অমলকে একটু আদর করিয়া চিঠি লিখিতে গেলেন। সমস্তক্ষণ অমল চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল।

চিঠিরও শেষ আছে। লেখা শেষ করিয়াই বৌদির মনটি স্নেহে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই শিশুটি শুধু তার জন্য তার দুরন্তপনা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া আছে। ঘুমাইয়াছে কি না তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। তাই অনুচ্চ স্বরে কহিলেন—

ঘুমিয়েছ অমল?

হাঁ ঘুমিয়েছি—বলিতেই বৌদি হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'ঘুমন্ত মানুষ কি কথা কয়?'

কী করব, ঘুম পাচ্ছে না যে।

তবে চুপ করেছিলে যে?

একেই বলে যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। অমল আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, 'এদিকে এসো বৌদি।' বৌদি তার পাশে গিয়া তার বুকের উপর ঝুঁকিয়া কহিলেন, 'কী ভাই?' এবার অতি আস্তে তার বড় বড় চোখদুটি মেলিয়া

অমল জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি মরবে না বৌদি, আর চিঠি লিখবার সময়ে গল্প শুনব না, তুমি আমায় সন্ধ্যার সময়ে বোলো'—বলিতে বলিতেই তার চোখের কোণে জল দেখা দিল।

'ওরে আমার মাণিক,' বলিয়া বৌদি তাহাকে বুকে জড়াইয়া কহিলেন, 'আমি মরব কেন, বালাই, আমি সরল-কুমারকে একটা ছোটরাণী এনে দেব, একদিন সেও বিদেশে যাবে, ছোটরাণী চিঠি দেবে, যাদু আমার, আমার জন্য চুপ করেছিলে এতক্ষণ?'

অমলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পাঞ্চভৌতিক

বহু বৎসর পরে আমরা পাঁচ বন্ধু যখন একসঙ্গে হইলাম, তখন বর্ষা শেষ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু শরৎ দেখা দেয় নাই। ঠিক হইল যে যোগ্য রকমের একটি অনুষ্ঠান হওয়া চাই এবং সেজন্য আমরা মেঘনায় এক সপ্তাহের জন্য নৌকা-বিহারে যাইব। আমাদের একটি বজরা ছিল। আর একটি জোগাড় করা হইল। সঙ্গে রহিল আর দুটি ছোট নৌকা—একটিতে রান্না হইত, অপরটিতে চাকরেরা থাকিত।

সতীশ একলা রহিল। আমাদের বজরাতে চারজনের স্থান ছিল, সতীশ ইচ্ছা করিয়াই একা এক বজরাতে রহিল কিন্তু সেখানে সে শুইতে যাইত মাত্র, বাকি সময় সে আমাদের বজরাতেই কাটাইত। সকলেরই সমান উৎসাহ এবং সকলেরই এক মত যে বাঙ্গালী পুরুষেরা যে এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহার প্রথম কারণ তাহাদের জীবনের নিরানন্দতা এবং দ্বিতীয় কারণ তাহারা কাজ হইতে মাঝে মাঝে ছুটী লয় না, কিম্বা লইলে ছুটী উপভোগ করিতে জানে না।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল মতের ঐক্য ঐখানেই শেষ। সোমেন্দ্র ও প্রভাস আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। প্রভাস

মফঃস্বলে বড় উকিল—কিন্তু তাহার মন যেন একালে অনেক ঘোরাফেরা করিয়া সেকালে ফিরিয়া গিয়াছে। সোমেন্দ্র ডাক্তার—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার এক কন্যার মৃত্যুর পর হইতে সাইকিক্ রিসার্চ্চ লইয়াই আছে। স্পিরিট আনিতে পারিত এবং পরলোকের ভূগোল ও ইতিহাস, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র এই সব সম্বন্ধে বহু খবর সে ষ্টেড্ সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কন্যার আত্মার প্রমুখাৎ অনেক জোগাড় করিয়াছে।

তৃতীয় বন্ধু, নরেশ, কবি। পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত কোম্পানির কাগজ তাহাকে অন্নচিন্তা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত করিয়াছিল। ইদানীং সে 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব' বলিয়া একখানা বই লিখিতেছিল। পঞ্চম, সতীশ, সবচেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু সব চেয়ে বড় তার্কিক। তর্কশাস্ত্র সে এত বেশি অধ্যয়ন করিয়াছিল যে তাহাকে কোন কাজে রাজি করাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহার কাছে একটি বিপরীত প্রস্তাব করা। আমরা কোনো ডাকবাংলাতে গিয়া এক সপ্তাহ কাটাইবার প্রস্তাব প্রথমটা না করিলে সে বোধ হয় এই নদীভ্রমণে আসিতে সম্মত হইত না।

এই চারজনে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি চলিতেছিল। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভগবান। তিনি যে এই কথার স্রোতে কতবার ভাসিয়া আসিলেন, আর কতবার ভাসিয়া গেলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কতভাবে যে তাঁহাকে আসিতে হইত ঠিকানা নাই,—রূপ হইতে সৃষ্টি, সৃষ্টি হইতে

স্রষ্টা, কার্য্য হইতে কারণ, কারণ হইতে আদি কারণ; অন্ত হইতে অনন্ত, মৃত্যু হইতে মৃত্যুঞ্জয়, কাল হইতে মহাকাল, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা। এমন কথাটি উচ্চারণ করিবার সাধ্য ছিল না যাহাতে নাকি শেষ অবধি তাঁহার টান না পড়ে। শুনিয়া শুনিয়া আমার মনে হইত যাহা নাই, তাহা কি মানুষের মন, তাহার চিন্তা এমন করিয়া টানিতে পারে? এক একবার ভাবিতাম বৈষ্ণব কবিদের কথা মিথ্যা নয়—নিত্যবৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশী বোধ হয় আজো বাজে। সতীশ যখন বলিয়া উঠিত—'প্রত্যেক বস্তুরই যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে ভগবানেরও কারণ আছে, আর কারণহীন অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তবে ভগবানকে কল্পনা করার কোনো যুক্তি নাই'—তখন তাহার জোর গলা শুনিয়া আমার মনে হইত যেন কোনো ব্রজ গোপী শ্যামের বাঁশী শুনিতেছে আর জোর করিয়া নিজেকে বোঝাইতেছে যে অর্থহীন ও সঙ্কেতহীন ঐ বংশীধ্বনি। যখন বলিত—'তোমরা বলো মানুষ ভগবানের হাতের সৃষ্টি, কিন্তু তোমাদের মুখে তাঁর বর্ণনা শুনলে মনে হয় ইউ আর্ রিটার্ণিং দি কম্‌প্লিমেণ্ট।'—তখন মনে হইত যেন সেই গোপীই বলিতেছে 'শুনেছি তার বরণ কালো, তারে না দেখাই ভালো'।

কথার এত অপব্যয় দেখিয়া আমি হাসিলেই সতীশ ভীষণ ক্ষেপিয়া যাইত। বলিত—'তুমি মনে করো চুপ করে থাকলে একটা চমৎকার সুপিরিয়রিটির ভাব আসে, নয় কি? কিন্তু তোমার ও পলিসিতে বেশি দূর এগোয় না। খালি সিন্ধুক

তালাবন্ধ দেখলে প্রথম প্রথম হয়তো মনে হয় যে ধনরত্ন আছে বা কিছু, কিন্তু একদিন না একদিন সে ফাঁকি প্রকাশ হয়ে পড়েই।

সত্যই সতীশের সঙ্গে পারিবার জো ছিল না। কথা কহিলে সে প্রতিপন্ন করিয়া দিত যে কথাটা মূর্খের মতো বলা হইয়াছে। আর কথা না কহিলে কী বলিত তাহা উপরে বলিয়াছি।

কিন্তু এসব তার উপরের ঢেউ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সত্য সত্যই গভীর সৌহার্দ্দ্য ছিল।

২

সেই মেঘনার বুকে বসিয়া বসিয়া আমার মনে হইত যে মানুষ দিনের নাম দিয়া, মাসের নাম দিয়া, পঞ্জিকা সৃষ্টি করিয়া এই চিরনবীনা ধরণীকে কী পুরাতনই না করিয়া দিয়াছে। কে বলে একটি দিন আর একটি দিনেরই মতো। কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছে আজিকার সূর্য্য কাল উঠিয়াছিল। স্থলে এ সব কথা বলা চলে বটে, কিন্তু নদীর বুকে ইহার অর্থ নাই। নদী মানুষের সকল দান, সকল অপমান গ্রহণ করে কিন্তু কিছুরই ছায়া বুকে রাখে না। এ যেন কোন নামহীন সুরাঙ্গনা—সহস্র দেবতার বিলাস সহচরী হইয়াও রাত্রি প্রভাতে অম্লান যৌবনের যাদুমন্ত্রে চিরকুমারী।

নদীর বুকে ভোরের আলো—মনে হইত যেন সৃষ্টির

প্রথম জ্যোতি সবে পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছে আর সঙ্গে আসিয়াছে সদ্যোজাত প্রাণ। এই ধরণীতে জীবনের উৎসব হইবে সেই বার্ত্তা যেন চলিয়াছে তৃণে তৃণে, পল্লবে পল্লবে, কীট-পতঙ্গে, পাখীতে পশুতে। তাই এত গান, এত হাসাহাসি, এত কানাকানি। আর সে তো শুধু সূর্য্যের আলো নয়, তাহার সহিত মিশিয়াছে নব জীবনের অপূর্ব্ব রূপভাতি। তাই এত মনোহর দুপারের শ্যাম তরুশ্রেণী, আর্দ্র শষ্পাবৃত প্রান্তর। সৌরভাকুল নদীর জল। কান পাতিলে যেন শোনা যায় নদীর প্রবাহের সহিত তাল রাখিয়া উঠিতেছে রসস্রোত তরুণ-কিশলয়ে, নবীন ধান্যমঞ্জরীতে।

তারপর দিনের যৌবন—সে রূপ যেন চোখে সহে না। কোথায় ছিল সকাল বেলা তৃণে তৃণে এত ফুল, পল্লবান্তরালে এত ফল। নদীর কূলে আর মাটি নাই, সোনা হইয়া গিয়াছে। জীবনের রাজা যেন যজ্ঞে আহুতি দিয়া নদীর বুকে দুহাতে ছড়াইতেছেন চূর্ণ হীরক। তাঁহারি কিরীটের মণিমাণিক্য ঝলসিয়া উঠিতেছে দুএকটি পাখীর পাখায়।

তারপর সূর্য্যাস্ত—সে করুণ নয়, কোমল নয়। পশ্চিমাকাশে যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুনরভিনয় হইতেছে। আকাশময় বহিতেছে শোণিত-গঙ্গা—এ যেন আসন্নমরণা ধরিত্রীকে জীবিত রাখিবার জন্য সূর্য্যের শেষ চেষ্টা। তারপর চারিদিক হইতে আসে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মরণের অন্ধকার। নদীর ছল ছল শব্দে মনে হয় যেন তাহার ধারাও ফুরাইয়া আসিতেছে। তারপর ওঠে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ—যেন

আশাহীন রোগীর হাসি হাসিয়া বলে—সব শেষ হওয়ার আর দেরি নাই। রাত্রিশেষে চাঁদ অস্ত গেলে ঘেরিয়া আসে মৃত্যুঘন নিতল অন্ধকার। তারপর নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় সে আঁধার যেন কাঁপিতে কাঁপিতে আলোর পথ করিয়া দেয়। সে আলো মানুষের ক্ষীণতাব্যর্থতাদুষ্ট জীর্ণ আলো নয়,—প্রলয়াবসানে নবসৃষ্টির প্রথম আলো। নদীর বুকে সৃষ্টি-প্রলয়ের লীলা চিরদিন চলিতেছে।

৩

ফিরিয়া আসিবার দুএকদিন আগে এক রাত্রিতে সান্ধ্য আহার শেষ করিয়া বজরার ছাদে বসিয়াছি এমন সময়ে নরেশ কহিল,

'আমার আজ ক'দিন সন্ধ্যাতেই মনে হচ্ছে এ যেন নূতন নয়। যেন কবে কোথায়ও ঠিক এই ভাবে নদীর বুকে সন্ধ্যা কাটিয়েছি।'

সোমেন্দ্র উত্তর দিল, 'ও সব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির ছায়া, সকলেরই মাঝে মাঝে ঐ রকম মনে হয়।'

বহুক্ষণ তর্ক করিতে না পারিয়া সতীশ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহার সুযোগ মিলিল—উচ্চৈঃস্বরে খানিকটা হাসিয়া কহিল,

'আমার মনে হয় সোমেন্দ্র ডাক্তারিটা ভালো ক'রে পড়ে নি। তোমাদের যে এরকম মনে হয় তার একমাত্র কারণ

তোমাদের লিভার ভালো নয়। কুসংস্কার আর কিছু খুঁজে পেলে না শেষকালে কিনা পূর্ব্বজন্ম—

সোমেন্দ্র সতীশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'কেন, জন্মান্তর মানো না তুমি?'

সতীশ বলিল, 'শুনেছি সোভিয়েট রাশিয়াতে কোথাও কোথাও লেখা আছে, রিলিজিয়ন্ ইস্ দি অপিয়াম্ অফ্ দি পিপ্‌ল্। আমি এ দেশের রাজা হলে গ্রামে গ্রামে প্রচার করাতাম যে আমাদের দেশের জন্মান্তরবাদটাও তাই। স্বস্তিতে থাকবার এমন উপায় আর নেই। এ যেন ডিভাইন রাইট অফ দি কিং।'

সোমেন্দ্র একটু বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করিল, 'খুলে বলোই না কোথায় তোমার আপত্তি?'

সতীশ উত্তর দিল, 'সব খানে, প্রতি পদে, কী পাপ করেছি তা জানলাম না, অথচ তার শাস্তি ভোগ ক'রে শোধরাব—এ যে কী ক'রে হয় তা আমি বুঝতে পারি না। আর যুগে যুগে তো পাপের অর্থের বদল হচ্ছে। তাছাড়া এ জন্মের কষ্ট যদি আর জন্মের পাপের ফল হয়, তবে আর জন্মে পাপ করতে গেলাম কেন? হয়তো বলবে সেটা আরো আগের জন্মের পাপের ফলে। এতে সমস্যার কোনো সমাধান হয় না, উত্তরটা কিছু পেছিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু যারা পীড়িত, বঞ্চিত, পদদলিত, তাদের সান্ত্বনার জন্য এমন থিওরি আর আবিষ্কার হয়নি।'

সোমেন্দ্র কহিল, 'কিন্তু এক পিতামাতার সন্তানদের

জীবনেও তো সুখদুঃখের তারতম্য হয়। আর স্বয়ং বুদ্ধদেব অবধি জন্মান্তর মানতেন।'

সতীশ উত্তর দিল, 'এক পিতামাতার সন্তান ব'লে কি ভাইয়েরা সমান হবে? এর উত্তর হেরেডিটি ও মেণ্ডেল্‌স্‌ ল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে। তা ছাড়া এন্‌ভাইরনমেণ্ট কথাটার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ দিয়েছি আমরা। মায়ের পেট যে আমাদের প্রথম এন্‌ভাইরনমেণ্ট সেটা আমরা ভুলে যাই। সব সন্তানের বেলাতেই কি মায়ের স্বাস্থ্য সমান থাকে? আরো কথা, মানুষের মনের ভালোমন্দর পরিচয় পাওয়া যায় কিছু বয়স হলে। কিন্তু কোনো দুই ভাইয়ের শৈশবের অভিজ্ঞতা ঠিক এক নয়। আজকালকার সাইকোলজিষ্টরা বলেন শৈশবের এক একটি ঘটনাতে সমস্ত জীবনের ধারা বদলে যেতে পারে। এই থেকে বোঝা যায় আইডেণ্টিক্যাল টুইন্‌স্‌-রাও যে ঠিক এক রকম হয় না কেন। বুদ্ধদেবের কথা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাঁর জন্মান্তরবাদ ও প্রচলিত জন্মান্তরবাদে আকাশপাতাল তফাৎ—তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারই করেন নি। মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করেছিলেন—'

নরেশের এ সব ভালো লাগিতেছিল না। সে কহিল, 'সতীশ, আজ রাত্তিরেও তুমি তর্ক করবে?'

সতীশ বলিল, 'কেন, পাঁজিতে বারণ আছে না কি?'

নরেশ উত্তর দিল, 'পাঁজিতে বারণ না থাকতে পারে, আর

থাকলেও তুমি শুনবে না, কিন্তু এই রাত্রির বারণ থাকতে পারে।'

'অস্যার্থ?'

'এই নদীবক্ষে এই রাত্রিটি এমন সুন্দর, এমন স্নিগ্ধ, একে নীরবে শুক্তির মতো বুক খুলে গ্রহণ না করলে জীবনে মুক্তা ফলবে না। ভেবে দেখো, যতদিনই বাঁচো না কেন, এই রাত্রি, এই নদী, এই বন্ধু সম্মিলন—ঠিক এই ভাবে আর কোনোদিন ফিরবে না, তোমার জীবনে তো নয়ই, অনন্তকালেও নয়।'

সতীশ আবার হাসিল, তারপর বলিল, 'দেখো আমার মনে হয় তোমার এ একটা Pose মাত্র। রূপ ব'লে রঙ ব'লে কিছু নেই। মানুষের চোখ যদি না থাকত তবে সৃষ্টিতে থাকত শুধু বিভিন্ন রকমের কতগুলি ঢেউ। সেগুলি যে কিসের তার নামও আজ দিতে পারি না। চোখের কারখানায় পড়ে তবে ফুটে উঠল আলো হয়ে, রঙ হয়ে। আচ্ছা, সেই কারখানার কলকব্জা যদি কিছু বদলে দেওয়া যায় তাহলে তোমার এত রূপের কী হবে বলো তো?'

নরেশের তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না। সে কহিল, 'তা জানি না। সৃষ্টিতে যা হয় নি, তা হলে যে কী হত এ কী করে বলব। আর রূপ, সে তো যে দেখে আর যাকে দেখে উভয়কে নিয়ে।'

তারপর স্বর নামাইয়া কহিল—'কখনো কি পড়োনি সতীশ, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি, 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহপ্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'—ও গানটার

মধ্যে একটা সমগ্র ফিলজফি নিহিত আছে। একবার গানটা শুনো কারো কাছে, বুঝবে মানুষের চোখ কেন অন্যরকম হয় নি। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ রকম আর একজন কবির মনে এসেছিল, তিনি হচ্ছেন পাশা কবি। তিনি বলেছিলেন—'সৃষ্টি আর স্রষ্টা যেন রূপসী আর তার নিজেরই রচিত দর্পণ।'

প্রভাস এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এবার কহিল—'আজকের এই রাত্রে তোমাদের এ আলোচনা আর বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার জীবনের একটি ঘটনা। তার সম্পূর্ণ অর্থ আজো আমি খুঁজে পাই নি। ইচ্ছা হচ্ছে তোমাদের বলি।'

সতীশ ছাড়া সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সমস্বরে কহিলাম, 'নিশ্চয়ই বলো।' সতীশ যেন এখন আলোচনাটির এই অপমৃত্যুতে বিমর্ষ হইয়া রহিল।

৪

প্রভাস কহিল,—'অন্যান্য অনেক নতুন ডাক্তার, নতুন উকীলের মতো আমিও প্রথম উকীল হয়ে কিছুদিন অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই ভর্ত্তি হয়েছিলাম হাইকোর্টে। মাসখানেক তার করিডরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো এদিক আর ওদিক করে কাটালাম, কিন্তু মক্কেলের দেখা নেই। ছাত্রাবস্থায় শুয়ে শুয়ে কত বক্তৃতা রচনা করেছি, কত

মোকদ্দমা জয় করেছি, কত আসামীকে আসন্ন মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্ত করেছি কিন্তু নিজের শক্তি প্রকাশ করবার সুযোগই পেলাম না। মনের আশা তাই মনেই রয়ে গেল। এ হেন সময়ে একদিন দেখা দেবকুমারের সঙ্গে। জুনিয়ার ব্যারিষ্টার-দের মধ্যে তার তখন খুব নাম। আমি মনে করেছিলাম আমাকে হয়তো চিনতেই পারবে না। কিন্তু দেখা হতেই তুহাত ধ'রে অনেক আলাপ করল। তারপর বল্‌ল সে বরানগরে থাকে। গঙ্গার কাছে তার এক বন্ধুর সুন্দর একটি বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছে। শুক্রবার কোর্ট ক'রে আমাকে সেখানে যেতে হবে এবং শনি-রবি তুটো দিন ওদের সঙ্গে কাটাতে হবে। আমার রাজি না হবার কারণ ছিল না। আমার সম্মতি পেয়ে খুব খুসী হয়ে তার নিজের কাজে চলে গেল।

'ছেলেবেলায় আমি মামার বাড়িতে থেকে পড়তাম। দেবকুমার আমার সঙ্গে পড়ত। বয়সে বোধ হয় আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। এন্‌ট্রান্স পাশ করবার পর আর তুজনে দেখা হয় নি। আমি উকীল হয়ে বেরোবার কয়েক বছর আগেই সে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। তারপর খানিকটা নিজের প্রতিভায়, আর খানিকটা আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে, অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পশার ক'রে তুলেছে।

'শুক্রবার যখন বরানগরে পৌঁছালাম তখন রাত্রি হয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, ঠিক গঙ্গার উপরেই। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান ও টেলিফোন আছে। বাড়ির নদীর দিকটা রেলিং

দিয়ে ঘেরা আর সব দিকে পাঁচিল। দক্ষিণাংশে একটি বড় ফুল বাগান পূব উত্তর দিকে কেয়ারী করা ছুটি মালতীর কুঞ্জ তারপরে একটি শিউলিবীথি শেষ হয়েছে একটি ছোট পুকুরের বাঁধানো ঘাটে। বাড়িটি দোতালা, উপরে ও নীচে দক্ষিণে খুব বড় বারান্দা। মেজে ও সিঁড়ি মার্ব্বেলের। নীচে প্রায় সমস্ত বাড়ি-জোড়া ফরাস-পাতা বসবার ঘর। পাশে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, সেটা দেবকুমারের অফিস। নীচের বসবার ঘরটির বিশেষ ব্যবহার হত না। উপরে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছোট একটি বৈঠকখানা ছিল। শোবার ঘর সব ক'টিই উপরে। দোতালার বারান্দাটি বড় মনোরম। ছুকোণে ছুটি শান্তিলতা উঠেছে। বারান্দাময় নানারকম ফুল ও পামের টব।

'বাড়ি ও কম্পাউণ্ড দেখিয়ে দেবকুমার আমাকে উপরের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল। সে ঘরটির সাজ-সজ্জায় একটি সুশোভন ও সংযত ভাব ছিল। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোনো রকম রুচিপ্রাখর্য্যই চোখে খোঁচা মারে না। ঘরটি দেখে বললাম—'বেশ সুন্দর সাজানো তো। এমন ড্রয়িং রুম আমি দেখেছি ব'লে মনে হয় না।'

"যিনি সাজিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'"—ব'লে দেবকুমার তার স্ত্রীকে ডেকে আনল।

'তাকে নিয়েই এ কাহিনী, অথচ আশ্চর্য এই যে বহু চেষ্টা ক'রেও আজ তার মুখখানা মনে আনতে পারি না। মনে পড়ে ভেবেছিলাম সুন্দরী, কিন্তু একটু বেশি রকম কৃশা।

আর মনে পড়ে তার চোখ ও ভ্রূ দুটির কথা। সে চোখে দুরকমের দৃষ্টি ছিল। সময়ে সময়ে মনে হত যেন সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানুষের অন্তর খোলা বই-এর মতো পড়ে নিচ্চে। কিন্তু যখন সে চুপ ক'রে কোনো দিকে চেয়ে থাকত তখন মনে হত যেন তার অন্তরলক্ষ্মী বাতায়ন খুলে দেখছেন সৃষ্টির এ অফুরন্ত শোভা। কী সরল সে দৃষ্টি, কিন্তু কী গভীর, যেন অতল নদীর স্বচ্ছ প্রবাহ। আর এমন সুন্দর ভ্রূ আমি কখনো দেখি নি। যেন সৃষ্টিশেষে বিধাতা তার ললাটে পরিয়ে দিয়েছেন রূপের জয় মুকুট। সমস্ত মুখে ছিল একটি স্বাভাবিক প্রতিভার দীপ্তি—শুধু তার কৃশতা দেখে মনে হত যেন দেহ মনের সংগ্রামে তার দেহ মনের কাছে চির-দিনের জন্য পরাজয় স্বীকার করেছে।'

এবার নরেশ কহিল—'চোখ দুটি যে তোমার অত মনে আছে তার কারণ আছে, চোখে মানুষ বিধাতার ছাপ নিয়ে আসে। এইখানে পাবে তার সত্যিকার অন্তরের পরিচয়। তার মুখে থাকে সংসারের ছাপ। সেখানে থাকে লেখা যে মানুষটির সংসারের সঙ্গে কী রকম বনিবনাও হচ্ছে। আরো একটি কথা আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে—নারী আমার মনে হয় তিন রকমের। এক, যাদের দেহ প্রবল, মন দুর্ব্বল। আর এক, যাদের দেহমনের সম্বন্ধ ঠিক এর বিপরীত। শেষ শ্রেণী হচ্ছে তারা যাদের এ দুয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় আছে। প্রথমা যেন সেই শ্রেণীর লতা যার আকাশ কামনা নেই, শুধু মাটি জুড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয়া হচ্ছে যেন জলভরা কাঁচের

পাত্রে ফুলের স্তবক। আর তৃতীয়া হচ্ছে যে লতা উপরে উঠেছে কিন্তু মাটি ভোলে নি, যার মূল ও ফুল পরস্পরের ঋণ স্বীকার করে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার বন্ধুস্ত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর নারী।'

সতীশ বহুকষ্টে বাক্‌সংযম করিয়াছিল। এবার কহিল,—'নরেশের কথার কোনো অর্থ আমি কোনোদিন খুঁজে পেলাম না। দেহ মনকে অমন স্বতন্ত্র ক'রে দেখা চলে না—দেহ মনের সম্বন্ধের বিষয়ে যে সিদ্ধান্তটি আমার সঙ্গত মনে হয় সেটি হচ্ছে একটি সাইকো-ফিজিক্যাল মোনিজ্‌ম্।'

এবার সোমেন কহিল, 'তা তোমাদের আলোচনা না হয় পরে করলে। প্রভাসকে গল্পটা বলতেই না হয় দিলে।'

প্রভাস আবার আরম্ভ করিল, 'কিন্তু বহুদিন দেবকুমারের স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয় নি। দেবকুমারের সঙ্গেও এ যাওয়া আসা থাকত কিনা সন্দেহ, কারণ বাল্য-বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হলে লাগে বেশ, কিন্তু তার সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ফিরিয়ে আনা বেশ শক্ত, কারণ ততদিনে জীবনের অনেক বদল হয়ে যায়। কিন্তু দেবকুমারের ধারণা ছিল যে সে দাবা খুব ভালো খেলে। জিনিসটাতে আমার নেশা তো জানো। তোমরা যতই ভাবো না কেন, আমি বলি সভ্যতার ভবিষ্যৎ ঐ খেলার মধ্যে। এ খেলাতে যুদ্ধের কামনা মেটে, আর যারা খেলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্রের সীমা নেই। লীগ্ অফ্ নেশন্‌স্ যে কেন এই সহজ সত্যটি দেখে না বলতে পারি না। যাই হোক্, এ খেলার

আকর্ষণে সে আমাকে প্রতি সপ্তাহান্তে ছুটী কাটাতে বলত বরানগরে, আমিও আপত্তি করতাম না। কিন্তু তার হাতে অনেক কাজ। যখন কাজ করত তখন আমি আমার নিজের ঘরে ব'সে যা হয় একটা কিছু পড়তাম। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সাথে বেশি মেশা আমার অভ্যাস ছিল না। তাই এক খাওয়ার সময়ে ছাড়া দেবকুমারের স্ত্রীর সাথে আমার বেশি দেখা হত না। তবে সেও একলা থাকত না। তার অসংখ্য বন্ধু ছিল, অধিকাংশ পুরুষ। সকাল থেকে তাদের আসা সুরু হত, আর সন্ধ্যা আটটা অবধি যেন সে সভা ভেঙ্গেও ভাঙত না। আমার সঙ্গে তাদের বেশি দেখা হত না, কিন্তু নিজের ঘর থেকে শুনতে পেতাম তাদের হাসি গান কখনো বা দুএকটা কথা। কখনো বা নীচে দুজনে খেলছি বা ব'সে আছি, কোনো তরুণ যুবক এসে জিজ্ঞাসা করত, মিসেস বাসু বাড়িতে আছেন কিনা। দেবকুমার খেলা রেখে তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে স্ত্রীকে খবর দিয়ে ফিরে এসে হয় খেলত না হয় কাজ করত। এদের স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের কথা আমি তখন খুব তলিয়ে ভাবি নি। এরা দুজনে যে দুজনকে একেবারে ভালোবাসে না এ আমার মনে হয় নি। কিন্তু তখনই যেন আমার মনে হত যেন এদের পরিচয় কিছু পথ এসে থেমে গেছে। দুজনই দুজনের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা প্রাণ দিয়ে করত, কিন্তু তার বেশি যেন আর কিছু নয়। হাতে কাজ না থাকলে, খেলতে ইচ্ছা না করলে, দেবকুমার আইনের বই খুলে নিয়ে বসত, কিন্তু তবু দেখিনি কখনো তার

স্ত্রীর সঙ্গে, এক খাবার টেবিলে ছাড়া, দুদণ্ড বসে গল্প করতে। কিন্তু, সেটা অনেকটা বুঝতে পারতাম। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত—এসবের চর্চ্চায় দেবকুমারের মন জাগত না। সে মন ছিল অন্য ছাঁচে গড়া। কিন্তু তার স্ত্রীর বাইরের পুরুষদের সঙ্গে এত মেলামেশাতেও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ঈর্ষার ভাব আসতে দেখিনি। ভাবতাম হয় লোকটা অসাড়, না হয় স্ত্রীর উপর অগাধ বিশ্বাস, না হয় নিজের মন খুব লুকোতে পারে। এ সব নিয়ে সে নিজে থেকে কোনো আলোচনা কখনো করে নি। আমারো শেষের দিকে অনেকবার ইচ্ছে হলেও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

'একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেবকুমার নীচের ঘরে বসে কাজ করছে, আমি আমার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় আয়া এসে বললে যে মেম সাহেব বসবার ঘরে আমাকে সেলাম জানিয়েছেন।

'ভাবলাম কোনো কাজে বুঝি বা দরকার। গিয়ে দেখি দেবকুমারের স্ত্রী একলা বসে কী একটা বই পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাকছিলেন আমায় ?"

'সে বলল, "হ্যাঁ।" তারপর কিছুক্ষণ কোনো কথা না ব'লে বই পড়তে লাগল। আমিও কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

'তারপর বইখানা বন্ধ ক'রে সে বল্‌ল, "কই কী জন্যে ডেকেছি জিজ্ঞাসা করলেন না যে।"

'আমি বললাম, "ডেকেছেন যখন তখন দরকার আছে নিশ্চয়ই।"

"আপনার কৌতূহল যখন এত কম, তখন আপনাকে সত্যি কথাটাই আমি বলব। আমার সংস্পর্শে এসে কোনো পুরুষ এত উদাসীন থাকে নি—এই আপনার মতো। কেউ বিশ্বাস হারিয়েছে, কেউ বা বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, কেউ বলে বুঝেছি, কেউ বলে বুঝি নি, কেউ বলে বুঝতে চাই না, কিন্তু আপনি এত উদাসীন কেন? একটা কম্‌প্লিমেণ্ট অবধি আমাকে দেন নি।"

'আমি তো অবাক। ভাবলাম আজকালকার মেয়েরা কি এই সুরে কথা বলে। শুধু বললাম, "আমি যে উদাসীন, একথা আপনি কী করে জানলেন।"

'এবার সে একটু হেসে বল্‌ল, "ও! কথা বলতে আপনি জানেন দেখছি। যা ভেবেছিলাম, তা নয় তাহলে।"

'আমি যে খুব একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছি, এটা আমার তখন মনে হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে সৌভাগ্য আমার হবে কিনা সন্দেহ ছিল, তাই বললাম, "আপনি সম্পর্কে আমার ছোটভাইএর স্ত্রী, না হয় ছোটবোন, আপনার সম্বন্ধে উদাসীন আমি কী করে হব?"

'তার মুখের ভাবের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম, কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইল। তারপর মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, "ভাসুর ভাদ্রবধূ ভাবলে যেন একটা ছোঁয়া ছুঁয়ির কথা মনে আসে। আমাকে আপনার ছোট বোন

ব'লেই জানবেন। কিন্তু তাহলে তো 'আপনি', 'মিসেস বাসু' এসব চলবে না, আমার নাম মঞ্জরী, তাই ব'লে ডাকবেন। আমি আপনাকে দাদা বলব।"

'ধীরে ধীরে আমার সঙ্কোচ কেটে গেল। আমার নিজের ছোট বোন ছিল না, সত্যি সত্যিই আমি মঞ্জরীকে ভালোবাসতে লাগলাম, ভালোবাসার যে অর্থ স্নেহ, সেই অর্থে—তার মধ্যে প্রণয় ছিল না। মনে পড়ে প্রথম যেদিন খাবার টেবিলে মঞ্জরী আমাকে দাদা ব'লে সম্বোধন করেছিল দেবকুমার খুসী হয়ে খুব হেসেছিল আর বলেছিল, "মঞ্জরী, এটা তোমার কত নম্বর ?" মঞ্জরী সে হাসিতে যোগ দেয় নি। বরাবর লক্ষ্য করতাম যে তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারে আর কোনো অস্বাভাবিকতা না থাকুক সে তার সঙ্গে কখনো হাসত না।

'এ স্নেহ যে ধীরে ধীরে কত গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা আজ আর বলতে চাই না। তাকে ভালো করে চিনতেই তার সম্বন্ধে এক এক করে ভুল ধারণা আমার ভাঙতে লাগল। কৃশ হলেও সে দুর্ব্বল ছিল না, অথচ দুর্ব্বলই তাকে দেখাত। রাত্রির পর রাত্রি জাগতে পারত, অথচ দিনের বেলায় ক্লান্তির কোনো লক্ষণ দেখতে পেতাম না। তারপর স্কুল কলেজে বেশি দিন না পড়লেও সে নিজে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিল এবং তার নিজের ভাববার, অনুভব করবার অসাধারণ শক্তি ছিল। সে শক্তির কাছে আমাদের পুঁথিগত বিদ্যাকে মনে হত যেন মায়ের কাছে বাৎসল্যরসের ব্যাখ্যা।

প্রগল্‌ভতা সে যথেষ্ট করত। অনেক কথা সে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে যা পরিচিত পুরুষের সঙ্গেও সহসা করতে আমার সঙ্কোচ আসে, কিন্তু সেটা ছিল তার মুখোস। বেশ বুঝতে পারতাম অন্তরে তার ছিল এক তপস্বিনী, সে যেন সাধনার মন্ত্র খুঁজে পায় নি। পথের সন্ধান পেলে যে কোনো মুহূর্ত্তে সে যেন এই বিলাস ব্যসন ছেড়ে বরণ করতে পারত তাপসীর গৈরিক। আর তার মনটা ছিল যেন কষ্টি-পাথর। যা কিছু ঝুঁটো, মেকি, সব সেখানে ধরা পড়ত। কোনো ছদ্মবেশ, কোনো অভিনয় তার চোখ এড়াত না।

'মনে পড়ে তার বন্ধুমণ্ডলীর নাম সে দিয়েছিল কেনেল। বলত ওরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর। একদল হচ্ছে ল্যাপ-ডগ্, পায়ের কাছে এসে লুটোতে পারলেই খুসী, আর একদল হচ্ছে গ্রেট্‌-ডেন্‌স্, দেখতে সিংহের মতো বটে, কিন্তু পোষ মানে খুব। আর শেষের দল হচ্ছে আল্‌সেশিয়ান হাউণ্ড—এদের সম্বন্ধে সাবধানে থাকতে হয়, সুযোগমতো এরা কামড়ে খেতে কসুর করে না।'

এবার সতীশ বলিল—'ও আর কিছু না, সাডিজম্ আর ম্যাসোসিজম্। মঞ্জরী বোধ হয় এ দুটো জিনিস জানতেন না।'

নরেশ উত্তর দিল, 'তিনি ও সব জানুন আর নাই জানুন, একটি ism আছে যা তুমিও জানো না।'

সতীশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—'কী '

নরেশ উত্তর দিল, 'নার্সিশিজম্।'

সোমেন বিরক্ত হইয়া কহিল, 'তোমরা যদি তর্ক চালাবে, তবে তর্কই চালাও, তাহলে প্রভাসকে আর গল্প বলতে বলা কেন।'

সতীশ, নরেশ দুজনেই কহিল তাহারা আর বাধা দিবে না।

প্রভাস বলিতে লাগিল—'একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমার বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া লেগে যায় না?" মঞ্জরী বলেছিল, "ঐ খানেই তো আমাদের রাজনীতি। শাসন করা ব্যবসাটা আমাদের, আপনাদের নয়। দেখেন নি ইতিহাসে যে ক'টি রাণী হয়েছেন, তাঁরা সকলেই খুব উপযুক্ত। প্রত্যেক বন্ধুকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন সেই সব চেয়ে বড় বন্ধু তাহলে সে অন্যদের দেখবে করুণার চোখে। যখন সকলে আসবে তখন সাজগোজ নিজের মনোমতো করা চলে। কিন্তু একলা যখন কেউ আসে, তখন পরখ করতে হবে সে কী ভালোবাসে। যে নিজেকে রসিক মনে করে তার কথায় হাসতে হবে। যার জীবন পরাজয় আর অপমানে ভরা তাকে অন্যের দোষ খুঁজে দিতে হবে। এ সব তন্ত্রমন্ত্র আছে অনেক।"

'মঞ্জরীর রাজসভায় আমিও দু-একদিন যেতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে তার অনেক বন্ধুর সঙ্গেও আমার আলাপ হল। আমার কিন্তু তাদের অনেককে বিশেষ খারাপ লাগে নি। দুএকজন বেশ আঁকতে বা গাইতে পারত। আমি বোধ হয় ল্যাপ্‌ডগ্‌ ও গ্রেট্‌ডেন্‌দেরই বেশি দেখেছিলাম। একদল

গল্প করত কালচারের, অন্যদল পৌরুষের। কিন্তু মোটের উপর এমন নিরীহ একদল লোক আমি দেখি নি। মনে হত যে এরা এক এক করে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হবে যদি মঞ্জরী একবার বলে, "এতই যদি আমাকে চাও, তবে আমাকে গ্রহণ করো, গোপনে নয়, চুরি করে নয়, আমাকে মুক্ত করো, তারপর নিয়ে চলো।"

'সংসারে প্রেমের চেয়েও বন্ধুত্ব বিরল। মঞ্জরীর বন্ধু এরা কেউ ছিল না। তাই ভাবতাম বন্ধুত্বের অন্তরালে এই *সব ভদ্র সন্তানেরা কী খোঁজে। একথা একদিন মঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল, "এই অন্বেষণই ওদের* একাধারে লজ্জা ও গৌরব। ভুলেও ভাববেন না যে ওরা একমাত্র আমার কাছে আসে, ওরা সোমবারে এক জায়গায় যায়, মঙ্গলবারে আর এক জায়গায়, এই রকম। কিন্তু সর্ব্বত্র খোঁজে সেই একই নারীকে। ওরা না জানলেও ওদের মন জানে যে তৃপ্তি বহুতে নয়, একে। সেইটি ওদের গৌরব। আর ওদের লজ্জা এই যে ওরা এত আনাড়ির মতো খোঁজে।

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আনাড়ির মতো কেন ?"

'মঞ্জরী হেসে উত্তর দিল, "না হলে আমার মতো বিবাহিত মেয়ের কাছে আসে, আর তার চোখের অতলে ডুবতে চায়, নয় হারাতে চায় নিজেকে তার চুলের কালো রাত্রিতে। কিন্তু সে তো তুচ্ছ কথা। ওদের গোড়ায় ভুল এই যে ওরা মনে করে নরনারীর সম্বন্ধটা সুখের বা একটি মধুর বেদনার

সম্বন্ধ। কিন্তু তা নয়, এর মধ্যে স্থায়ী সুখ বা মাধুর্য্য খুঁজে কেউ কখনো পায় নি, পাবে না।"

'আমি আবার প্রশ্ন করেছিলাম, "তবে কিসের এ সম্বন্ধ, কিসের এ আকর্ষণ?"

'মঞ্জরী বলল, "তাও কি খুলে বলতে হবে। সে তো আমাদের কবিরা বহুকাল আগে ব'লে গেছেন—যে আকর্ষণে কমল ফোটে দিনের আলোয় আর কুমুদ ফোটে জ্যোৎস্না রাতে। নারী পুরুষের সম্বন্ধ পরস্পারের পরিণতির সম্বন্ধ—তাতে সুখদুঃখ, তৃপ্তি বেদনা সবি হয়তো আছে, কিন্তু সেইটিই তার লক্ষ্য নয়। *মেঘের প্রতি চাতকের আকর্ষণ*—শুধু তার তৃষ্ণা, তাই তা কোনোদিন মেটে না।"

বল্‌লাম "মিটলেই তো ফুরিয়ে গেল।"

'সে বল্‌ল, "ফুরিয়েই তো যায়। কিন্তু তাতেই যে তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি। এযে, দাদা, যন্ত্রীর জন্য যন্ত্রের ব্যথা। প্রতিধ্বনিটি তো প্রতি মুহূর্ত্তে ফুরায় কিন্তু ফুরায় ব'লেই তো গড়ে ওঠে সুর। একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে কি কখনো জাগে সঙ্গীত। যে প্রণয়ে বিকাশ নেই, সে নিছক লালসা, সে প্রেম নয়। তাতে ব্যথা নেই। ব্যথা সেইখানে যেখানে যন্ত্রী একবার বাজিয়েও দেখে না যে সুর জাগে কিনা।"

৫

'দেবকুমার আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করলেও আমার নিজের কাজের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। এ সব নিয়ে

মঞ্জরীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। দেখতাম কী বিচক্ষণতার সঙ্গে সে একটি বিষয়ের সকল দিক বুঝতে পারত। আমাকে মফঃস্বলে এসে প্র্যাকটিস্ করবার পরামর্শ সেই প্রথম দেয়। প্রথম প্রথম ভাবতাম এত যার বুদ্ধি, সে খেলাঘর যদি কোনো কারণে পেতেও থাকে, তবে জীবনের এত সময় তাতে কেন কাটায়। পরে দেখেছিলাম সে খেলা তার অন্তরের কত তুচ্ছ অংশ অধিকার করেছিল। তার সুশৃঙ্খল সংসারের পিছনে ছিল তার কর্ম্মনিপুণ হাত দুখানি। কত রাত্রি জেগে নিজে পড়াশুনা করত। ইদানীং দান্তে পড়বে ব'লে ইটালিয়ান শিখছিল। মানচিত্র নিয়ে তাকে ওয়েল্‌স্-এর আউটলাইন অফ্ হিষ্ট্রি পড়তে দেখেছি। তার মনের তৃষ্ণা ছিল তার চোখের পিপাসারই অনুরূপ। কত ভোরে দেখেছি আঁচল ভ'রে শিউলী ফুল তুলে এনেছে। নববর্ষাতে নীল শাড়ী পরে ছাতে বৃষ্টিতে ভিজতে কী ভালোইবাসত। আর তারপর নদীটি ছিল তার নয়ন-মন-ভোলানো। কত-দেখেছি দোতালার বারান্দায় রেলিঙের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার দিকে চেয়ে আছে। অথচ এ সবের গল্প তাকে কখনো কারো কাছে করতে শুনিনি।

'মফঃস্বলে আসা তখন একরকম ঠিক ক'রে ফেলেছি। এমনি সময়ে একদিন মঞ্জরী বল্‌ল, "দাদা, আমার কেনেল যে এবার 'জু' হয়ে চলল।"

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে?"

'সে একটি রাশিয়ান যুবকের নাম করল। তা আমার

আজ মনে নেই। থাকলেও উচ্চারণ করতে পারতাম না। তারপর বলল, "শোনেন নি তার কথা? অত্যাধুনিক সমাজে সে যে শুক্ষ মালঞ্চে ভেসে আসা রাজপুত্র। যুবতীরা তার জন্যে রুমাল সেলাই করে, কিশোরীরা তার অটোগ্রাফ্ আর ফটোগ্রাফ্ নিয়ে এ্যালবাম সাজায়, আর প্রৌঢ়ারা তাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ায়।"

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কিসে তার এত প্রতিপত্তি?"

"আমি তো যতদূর দেখতে পাই তার রঙে। যে যাই বলুক, ও জিনিসটা আমাদের চোখ আর মন একটু ঝল্‌সে দেয় বই কি, তবে লোকটি ভারতবর্ষের খুব ভক্ত। ইংরাজ-দের দেখতে পারে না, ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, মাটিতে ব'সে ভাত খায়, আর তারপরে পান চিবোয়। কিন্তু তারি জন্যই শুনি সরমা নাকি তাকে তার সরমের ডালি উপহার দিয়েছে।"

"সরমাটি কে?"

"সে আমার এক ভূতপূর্ব্ব বন্ধু, ইদানীং সে আমার নাম শুনতে পারে না। তার সভা নাকি আমি ভেঙে দিয়েছি তাই জুটিয়ে ছিল এইটিকে—কিন্তু এও কয়েকবার আমার এখানে এসে গেছে।"

'কথাগুলির মধ্যে যেন একটা ঈর্ষার রেশ ছিল। আমি বললাম, "যে তোমার এক কালে বন্ধু ছিল তার সম্বন্ধে এই কথাটা এত সহজে বিশ্বাস করলে?" কথাটা যেন খুব কর্কশ শোনালো মনে হওয়ায় আবার বললাম, "জানো তো আমি উকীল মানুষ, প্রমাণে যদি মানুষকে দোষী

নির্দ্দোষ দুই-ই মনে করা যায় তবে তাকে আমি নির্দ্দোষই ভাবি।”

‘মঞ্জরী হেসে উঠল। বলল, অত ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না, দাদা। মেয়েরা পরস্পর হিংসে করে, পুরুষের উদারতা বেশি, এই তো। কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে। আপনাদের কাছে তো আমরা অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক কল্পনা। কিন্তু মেয়েরা পরস্পরের রণনীতি, রাজনীতি এ সব বুঝতে পারে, তাই তাদের চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত। দেখেন নি যে-মেয়ের যৌবনে দুর্নাম ছিল সে যখন মধ্যবয়সে ভয় পেয়ে পেতে চায় সুনাম, সুযশ, তখন সবার আগে খুসী করতে চেষ্টা করে তার সমাজের মেয়েদের। পুরুষকে নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।”

‘আমি বললাম, “যৌবনে দুর্নামের লোভই বা কেন, আর শেষেই বা কেন সুনামের এত অন্বেষণ?”

‘মঞ্জরী আবার হেসে বল্‌ল, “দুর্নাম, ওর মতো জিনিস কি আছে? তবে পরিমাণে অল্প হওয়া চাই। তাতে কারো জাগে শিভ্যালরি, কারো কৌতূহল, কারো বাসনা। এ যেন বিনা খরচে বিজ্ঞাপন। আর দেখেছেন তো অনেক টনিকে অল্প পরিমাণ বিষ থাকে। অল্প পরিমাণে দুর্নামের বিষও সেই রকম যৌবনের টনিক। কিন্তু টনিকই খান আর যাই করুন, যৌবন যায়, জীবন থাকে। ছেলে মেয়ের বিয়ের ভাবনা আসে। তখন যদি মানুষ সুনাম না খুঁজবে, তবে খুঁজবে কখন?”

'কী জানি আমার যেন মনে হল এর সব কথাগুলিই সেই আমার অপরিচিতা সরমার উদ্দেশ্যে বলা। তাই অন্য কথা পাড়বার জন্যে বল্লাম, "কিন্তু তোমার রাশিয়ানটির জন্যে জু করতে হবে কেন ?"

'সে বললে, "ও যে বেয়ার। ও শুধু নীচে থেকে মৌচাকের দিকে তাকিয়ে না পাওয়ার বেদনায় কবিতা লেখে না, গাছেও চড়তে চায়। যাক্, আগামী রবিবারে সে আসছে। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন এখন।"

'পরের রবিবারে তার সঙ্গে দেখা হল। হয়তো তার উপর আমি অবিচার করছি, কারণ এ শ্রেণীর লোককে আমি হুচোখে দেখতে পারি না। নিজের দেশকে যে ভালোবাসেনি সে আর এক দেশকে যে কী করে ভালোবাসতে পারে আমি বুঝতে পারি না। তারাই বিশ্বকে ভালোবাসতে পারে যারা আগে ভালোবেসেছে নিজের দেশকে। সেকস্‌পীয়র মানব-জাতির কবি, কিন্তু কী দরদই ছিল তার ইংলণ্ডের উপরে। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথের মুখেও বিশ্বের কথা মানায়। বাংলাদেশ তাঁর কবিতা পড়বার আগেও দেখেছ, আর পরেও দেখেছ, কিন্তু ভেবে দেখো তো কী তফাৎ। আর তিনিও তো প্রবাসে গিয়ে বিদেশী সাজেন নি। দেশপ্রীতি পৃথিবীতে অমঙ্গল এনেছে স্বীকার করি। কিন্তু সে ভুল রকমের প্রীতি। ঠিক ভাবে যে মা সন্তানকে ভালোবেসেছে সে জগতে কোনো শিশুর প্রতিই উদাসীন নয়। লোকটির উপর আমার একটি অসীম ঘৃণা হয়েছিল, তাই এত কথা বললাম। মঞ্জরীর

চায়ের মজলিসে সেই সেদিন সবার চেয়ে আগে এসেছিল। দেখলাম, যুবক সুদর্শনই বলতে হবে। ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা। তারপর আরো অনেকে এল। তাদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েও ছিল। তাদের কথা আজ আমার বিশেষ মনে নেই, তবে তাদের দু'একজনের সাজের কথা আমি ভুলতে পারি নি। দেখে মনে হয়েছিল এক্স্‌ট্রিমিটিস্ মীট্। সভ্যতার প্রথমে যা, সভ্যতার চরম পরিণতিতেও তাই। কারণ শুনেছি মানুষের বসন ভূষণ নাকি প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তার লজ্জা বা শীত নিবারণ করবার জন্য নয়, তার দেহের প্রতি কৌতূহল জাগাতে। তারপর সে সাজ সজ্জায় এল রুচি, বিস্ময় ও আত্মপ্রকাশ। তাদের দেখে মনে হল রুচিও গেছে, বিস্ময়ও আর নেই, তবে আত্মপ্রকাশ অন্য একটি অর্থে জাজ্বল্যমান।

'যাহোক, সে মজলিসে তর্ক উঠেছিল, "রূপ কী?" একজন বললে, "রূপ আর বাসনা একই বস্তু। বাসনা কুৎসিতকে সুন্দর করে, আর বাসনার অভাবে সুন্দরকে কুৎসিত করে। ওটা সম্পূর্ণরূপে প্রণয়ীর দান।"

'আর একজন বল্‌লে, "জাতিরক্ষার জন্য যে-টুকু বাসনা দরকার প্রকৃতি মানুষকে তার চেয়ে সে বস্তুটি ঢের বেশি দিয়েছে, এবং তারই উদ্বৃত্তাংশ দিয়ে মানুষ করেছে রূপের সৃষ্টি।"

'তৃতীয় একজন বললে, "তা নয়, বিধাতার মনেই হোক্ আর শিল্পীর মনেই হোক্, সৌন্দর্য্যের একটি আদর্শ আছে।

যে-যতটা সে আদর্শের কাছে, সেই আমাদের চোখে ততটা সুন্দর।”

‘এবার রাশিয়ান কথা কইল। বললে, “এ সবের মধ্যেই কিছু পরিমাণে সত্য আছে। একরকম রূপ আছে সেটা শুধু প্রণয়ীর দান। সেই সব মেয়েদের সম্বন্ধে সতীত্ব অসতীত্বের প্রশ্ন ওঠে। কারণ তারা প্রণয়ীর কাছে ঋণী; বিশ্বস্ততা দিয়ে সে ঋণ তাদের শোধ করা উচিত। কিন্তু আর এক রকম রূপ আছে যা স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা করে না। এসব রূপসীরা ধর্ম্মশাস্ত্রের বাইরে নয়, উপরে। তারা বিভিন্ন ভাবে সমস্ত পুরুষ জাতির প্রিয়া। ইউরোপে এককালে এক-রকম মেয়েরা ছিল যেমন ফ্রান্সে স্যালনের যুগ। কিন্তু এখন আর নেই, তারা পুরুষকে অনুকরণ করে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়েছে। প্রাচ্যের নারী তাই আজ জগতের অলঙ্কার। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হতেও তাদের দেখতে এলে তাই পরিশ্রমের অপব্যয় মনে হয় না।”

‘এই ব’লে সে খানিকক্ষণ মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে কী ভীষণ দৃষ্টি কী বলব। মনে পড়ে দুতিনবার চেয়ে দেখেছিলাম মঞ্জরী সত্যি সত্যিই কাপড়চোপড় পরে আছে কিনা।

‘সেদিন সভাভঙ্গের পর মঞ্জরীকে বল্‌লাম, “তোমার অন্য বন্ধুদের নিয়ে যা খুসী করো, কিন্তু ঐ রাশিয়ানটিকে তাড়াও।”

‘সে বল্‌লে, “কেন, ভালো লাগল না?”

"ওকে দেখে আমার কী মনে হয় জানো? ঔদরিকের যখন অগ্নিমান্দ্য হয়, তখন সে যেমন নতুন নতুন উগ্র খাবার খোঁজে, ওরও হয়েছে তাই।"

'আমি কথা শেষ না করতেই মঞ্জরী বল্‌লে, "তবুতো এখনো সব শোনেন নি। একদিন কী বললে জানেন? তখন বোধ হয় তুবার না একবার এসেছে। বললে, "কী জানেন মঞ্জরী দেবী'—মিসেস বাসু ও বলে না, বলে ওটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সব চেয়ে নিবিড় বন্ধন হচ্ছে গোপন পাপের বন্ধন। এ্যাডাম আর ইভের কাহিনী হচ্ছে ঐ সত্যের রূপক। কোনো বন্ধুত্ব, কোনো প্রণয় নিগূঢ় হয় না, স্থায়ী হয় না, যদি তার মূলে না থাকে গোপনে অনুষ্ঠিত কোনো পাপের স্মৃতি।"

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কী বললে?"

"কিছুই বলতে সাহস হল না, যেন কিছুই বুঝিনি ভাব দেখিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।"

'এ সব কাহিনী আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। খানিকক্ষণ পায়চারী করবার পর ওর সামনে এসে বললাম, "আমি শুধু ভাবছি যে কেন তোমার স্বামী এদের ঘাড় ধরে বের করে দেয় না।"

"সেই কথাই তো আমি এত বৎসর ধরে ভেবে এসেছি" ব'লেই দ্রুতপদে মঞ্জরী কক্ষান্তরে চলে গেল।

'সেই রাত্রি কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না। যখন বারান্দায় এসে বসলাম তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদ সবে অস্ত গেছে, রেখে

গেছে পশ্চিমাকাশে একটি অপরূপ জ্যোতি, যেন প্রণয়িনীর মুখে তৃপ্ত কামনার শান্ত দীপ্তি। সম্মুখে কলনাদিনী তারালোকস্নিগ্ধ গঙ্গা।

'হঠাৎ দেখলাম কখন মঞ্জরীও উঠে এসে আমার পাশে বসেছে। কী জানি কেন, কেউই কিছু বললাম না।

'তারপর ধীরে ধীরে সে মাথাটি আমার কাঁধে রেখে কাঁদতে লাগল। সে যে কী কান্না, বোঝাতে পারি না। যেন জীবনে যে কখনো কাঁদতে পায় নি, সে জন্মের শোধ কেঁদে নিচ্ছে। কিছু বলতে পারলাম না, তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কত ভাবলাম কিছু বলি, কিন্তু কোনো কথাই মুখে এল না। এ যেন নিশীথ রাত্তিরে রুগ্ন শিশুর কান্না। ব্যথা একটা কোথাও আছে, কিন্তু কোথায় তা জানবার উপায় নেই।

'খানিকক্ষণ পরে চোখ মুছে সে উঠে গেল। আমিও নিজের ঘরে এলাম।

'তার পরদিন থেকেই মনে হল যেন সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কোথায় গেল তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, আর শাণিত ভাষা। নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর মনে হতে লাগল। আমার কত কথা সে কত ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনেছে অথচ তার অন্তরের কথা একদিন জানবার চেষ্টাও করিনি। আর আজ সে চেষ্টা করাও বৃথা।

'যেদিন শেষ চলে আসি, সে আমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়েছিল।'

৬

'আধুনিক মেয়েদের উপর এক অভিনব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে মফঃস্বলে এলাম। ভাবতাম, দরকার হলে তর্ক করতাম যে ওরা যা খুসী করুক—ভোট নিক, আইন বদলাক, ইংরেজী বুলি আওড়াক, তর্ক বিতর্কে পুরুষজাতকে রসাতলে পাঠিয়ে দিক—যা চায় করুক, ওদের অন্তর ঠিক আছে। রাঁধুনীর জাত ওরা, মালমসলা জোগাড় করা, আর রান্নার শিল্প, এ দুয়ের প্রভেদ ওরা না জানে তো জানবে কে। আর যে অন্তরে শ্রদ্ধা ও স্নেহের মূল্য এখনো আছে, সে অন্তরে সাধ্য কী অমঙ্গল স্পর্শ করে। ওরা আমাদের যুগযুগান্তের সাধনা সরোবরের পদ্ম—কাঁটা, বিষ আর পাঁক এ সব অতিক্রম ক'রে অমলিন শোভাতে ফুটে থাকবে। আর ওরা আমাদের যেমন চাইবে, তেমনি তো হব আমরা। মুখ ফুটে কী চায় বলতে পারে নি বলেই না আমাদের এ দুর্দ্দশা।

'কয়েকমাস পরেই এল মঞ্জরীর মৃত্যুর খবর। আর সে কী সাংঘাতিক ও আকস্মিক মৃত্যু। ওদের স্নানের ঘরের পিছনে একটা বারান্দা হবার কথা ছিল, তাই সেদিকে একটা দরজা ছিল। বারান্দাটি করা হয় নি দরজাটি তাই সর্ব্বদা বন্ধ থাকত। খুললেই একদম শূন্য। শুনলাম, একদিন রাত্রিতে মনের ভুলে ঐ দরজা খুলে মঞ্জরী নীচে প'ড়ে যায়।

মাথার খুলির এক অংশ ভেঙে গিয়েছিল। হাঁসপাতালে নিতে না নিতেই সব শেষ হয়ে যায়।

'কী শূন্য লেগেছিল পৃথিবী কিছুদিন। কিন্তু সবই সয়ে আসে,—শুধু সহ্য করতে পারতাম না আবার সেই বাড়িতে গিয়ে থাকবার কল্পনা। তাই দেবকুমারের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও অনেকদিন যাইনি। শেষকালে সে সত্যই মনে কষ্ট পাচ্ছে দেখে প্রায় দুবৎসর পরে মহরমের ছুটীতে একবার গেলাম।

'দেবকুমার ষ্টেশনে এসেছিল—কিন্তু সে দেবকুমার যেন আর নেই। এই দুবৎসরের মধ্যে যেন তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। মাথার চুল কাঁচা পাকা, রং কালো হয়ে গেছে। ভাবলাম এর মনের কথাও তো কোনোদিন জানি নি। হয়তো এর পরে অবিচার শুধু আমি করি নি, মঞ্জরীও করে গেছে।

'তারপর সেই পরিচিত গৃহসজ্জা দেখে বুকের মধ্যে যেন একটা বাণাহত পাখী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না যে সে আর নেই—কোনোদিন আসবে না। শুধু মনে হতে লাগল শুধু চাই একটু জোর ক'রে ইচ্ছা করা। তাহলে সে অন্য ঘর থেকে হাসিমুখে যেমন আসত, তেমনি আবার আসবে।

'দেবকুমারের দাবাখেলার সখ কিন্তু যায় নি। সন্ধ্যায় কিছু খেলা হল। খাবার পর ও কাজ করতে নীচে চলে গেল। কখন উপরে শুতে গেছে জানি না। আমি আমার নিজের ঘরে শুয়েছিলাম। শোবার আগে বাড়িতে একটি

পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। বাড়িতে বরাবর টেলিফোন ছিল তুটি—। মঞ্জরী আফিস ঘরে গিয়ে কথা কইতে পারত না ব'লে তার টেলিফোন উপরে বৈঠখানাতেই ছিল। সেই টেলিফোনটি এ ঘরে আনা হয়েছে। এই ঘরেই এখন অনেক সময় দেবকুমার শোয়।

'তখন কত রাত্রি ঠিক বলতে পারব না। টেলিফোনের ঘণ্টায় জেগে উঠলাম। বাতি জ্বালিয়ে টেলিফোন ধ'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে ?"

'কী অদ্ভুত কাণ্ড, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ যেন মঞ্জরীর গলা। বললে, "এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, আমি

'বললাম, "মঞ্জরী ? তবে কি যা শুনেছিলাম সব মিথ্যে, তুমি আছ এ পৃথিবীতে।"

'উত্তর আসল, "না নেই, এসেছি আজ। একদিন গান শুনতে চেয়েছিলেন মনে পড়ে ? আজ শুনিয়ে যাব।"

'তারপর ধীরে ধীরে মৃত্নকণ্ঠে "হে মোর দেবতা" গানটি সমস্ত গাইল।

'একবার ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু রিসিভার আমার হাতে, নিজে খাট থেকে উঠে বাতি জ্বালিয়েছি, স্বপ্ন কী ক'রে হতে পারে। যাহোক গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় আছ তুমি মঞ্জরী ?"

'এবার সে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এসেছে, বল্‌লে, "আজ নয়, আবার আসব।"

'তারপর দু একবার "হ্যালো" হ্যালো" করতে এক্স্‌চেঞ্জের মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে কত নম্বর চাই।

'রিসিভার রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় তার মধ্যে থেকে এল যেন একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস। সে যে কী ঠাণ্ডা, হাত আমার হিম হয়ে এল। তারপর মনে হল ঘর দোর বিছানা সব যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। বাতি নিভিয়ে শুলাম, কিন্তু শীতে গা কাঁপিয়ে আনল। তোষক ও বিছানার চাদর তুলে সেগুলি গায়ে দিয়ে শুধু গদির উপর শুলাম, কিন্তু তবু যেন সে কাঁপুনি থামে না। দরজা খুলে বাইরে এলাম, সেখানেও সব হিম হয়ে গেছে। সে বাড়িটাই যেন বরফের তৈরী আর হিমে-ভরা সেখানকার বাতাস। আবার এসে শুলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, জেগে দেখি তোষক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, গায়ের ঘামে বিছানা ভিজে গেছে।

'দেবকুমারকে বলব মনে ক'রে কথাটা বললাম না। ভাবলাম,আমি তো দুদিন আছি, ওর এখানে চিরদিন থাকতে হবে। বেচারী একলা থাকে, ভয় না পেলেও অমন একটা কল্পনাকে সাথী করে নাই বা রইল। সেদিন ভাবতে ভাবতে আরো মনে প'ড়ে গেল যে সত্যিই চলে যাবার আগে মঞ্জরীকে একদিন গান করতে বলেছিলাম, কিন্তু কী গোল-মালে আর হয়ে ওঠে নি। গান সে করত সুন্দর, সমস্ত প্রাণ দিয়ে কিন্তু তাই গান করতে চাইত না সহজে। ও জিনিসটার মধ্যে সে তার নিজের ছদ্মবেশ রাখতে পারত

না, ধরা দিত। কিন্তু তেমনি প্রাণ দিয়েই কাল সে গেয়েছিল। কী এ—এ কি স্বপ্ন, না হ্যালুসিনেশন, কিছুই ভেবে কিনারা করতে পারলাম না।

'পরের দিন রাত্তিরে খাবার পর আমারি শোবার ঘরে দাবা বসল। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, দেবকুমারের উপর্য্যুপরি কয়েকবার জিতে উৎসাহ বেড়ে উঠল। আবার খেলা চলেছে, রাত্রি তখন প্রায় একটা হবে। দেবকুমার বললে "কিস্তি" সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। আমার গা আবার শিউরে উঠল।

"এত রাত্তিরে কে আবার ডাকে" ব'লে দেবকুমার উঠে ধরল, ও দুএক মিনিট পরেই ইংরেজীতে এক্স্‌চেঞ্জের সঙ্গে করলে খুব ঝগড়া। ফিরে এসে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী বলছিল ?"

'দেবকুমারের রাগ তখনো যায় নি, বললে, "মেয়েমানুষটি বলে কত নম্বর চাও। কিছুতেই স্বীকার করলে না যে সে রিঙ করেছে।"

'এইই আমার কথা। এখনো সময়ে সময়ে মনে হয় সত্যই কি মঞ্জরী এসেছিল, আর গান গেয়েছিল। তারপর দেবকুমারের কাছে অনেকবার গিয়েছি, সেই ঘরেই শুয়েছি। গা ছম্‌ছম্‌ করেছে, কিন্তু সে ঘটনা আর ঘটে নি।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর

সোমেন কহিল, 'আমার মনে হয় তুমি সেদিন ভয় পেয়ে ভুল করেছ। তোমার সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ ছিল। হয় তো পরে মেটেরিয়্যালাইজ করতেন। আর যার সঙ্গে আত্মার যোগ ছিল না তার সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়ায় তিনি আর ফেরেন নি।'

সতীশ একটা উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া বলিল, 'আমি জানতাম, সোমেন ঐ রকম কিছু একটা বলবে। ব্যাপারটি তো আমার কাছে জলের মতো সহজ। প্রথম রাত্তিরে প্রভাস দেখেছিল স্বপ্ন, পরের রাত্রি এক্স্‌চেঞ্জের মেয়েটি সত্যি সত্যিই ভুল করেছিল, দেবকুমার বিরক্ত হয়েছে দেখে স্বীকার করতে চায় নি।'

এর কিছু পরে আমাদের সভাভঙ্গ হইল আর সবাই নীচে চলিয়া গেল, সতীশ আর আমি কিছুক্ষণ ছাতে বসিয়া রহিলাম। যেখানে আমাদের বজরা লাগানো ছিল, সেইখানে নদীটা একটু ঘুরিয়া গিয়াছে। সতীশের বজরাটি বাঁকের অন্যদিকটায়। একটু দূর হাঁটিতে হয়।

এবার সতীশ উঠিয়া কহিল, 'চলো না ভাই আমার সঙ্গে একটু।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভয় কচ্ছে নাকি?'

সতীশ চুপি চুপি কহিল, 'ওদের কাছে বোলো না ভাই। নরেশ ঠাট্টা করে আমার প্রাণ বের করে দেবে। ভূত টুত আমি মানি না, কিন্তু ছোট বেলায় অনেক ভূতের গল্প শুনে কী যে একটা সংস্কার হয়ে গেছে, কাটিয়ে উঠতে পারি না।'

'চলো' বলিয়া তাহার সাথে গেলাম। বজরায় পৌঁছিয়া সতীশ বলিল, 'এখানে শুলেই না হয় আজ। আবার এতটা যাবে।'

কেন যে আমাকে সেখানে রাখিতে চায় তাহার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জায়গা হবে?'

সতীশ উত্তর দিল—'ক্যাম্প খাটটা গুটিয়ে ফেলে নীচে বিছানা পাড়ব এখন।'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'কিন্তু কাল কী বলব ওদের?'

'বোলো, এখানে বাতাস বেশি।'

শুইলাম কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। যাহাকে কোনো দিন দেখি নাই, কোনোদিন দেখিব না সেই মঞ্জরীর কথা অনেকবার মনে আসিতে লাগিল। ভাবিলাম সেই চির বধির যবনিকার অন্তরাল হইতে আসে কি কোনো সুর? মৃত্যুর পর থাকে কি কিছু? কিন্তু সারা জীবন ভাবিয়া তো দেখিয়া আসিতেছি যে ব্যক্তির সুখ দুঃখ লইয়া প্রকৃতি কিছুমাত্র ব্যস্ত নয়। তার চিন্তা জাতি সংরক্ষণে। এই মৃত্যুহীন অনন্ত নক্ষত্রের নয়নতলে, এই সুষুপ্ত নদীর কূলে কূলে ঘটিয়াছে কত জন্ম, কত মৃত্যু, কত প্রণয়, কত পরিণয়, কত উত্থান, কত পতন। কত বুক ভাঙিয়াছে, কত আশা চিতানলে শেষ হইয়াছে। কোথাও কোনো চিহ্ন তো তার নাই। প্রভাস ঠিকই অনুভব করিয়াছিল। থাকিতে পারে মহাকাশে কোটি সূর্য্য, কিন্তু এ বিশ্বের অন্তর উদাসীন-

তার হিমাচ্ছন্ন। কিন্তু তবু হৃদয়ের গোপনপুরে এ কোন আরব রূপসী প্রতিদিন নূতন কাহিনী শোনায়, তাই প্রত্যহ তাম্বু ভাঙি, প্রত্যহ পথ চলি।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ একটু শব্দ হওয়ায় জাগিয়া দেখি সতীশ বজরার জানালা বন্ধ করিতেছে। আমি জাগিয়াছি দেখিয়া কহিল, 'আজ বিশেষ গরম নয়, জানালাগুলি বন্ধ করে দি, কী বলো ?'

'দাও', বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম।

পরশ পাথর

অনেকদিন অসুখের পর শৈল আজ ২।৩ দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছে। দুপুরের পর হইতেই মা ও মেয়েতে অনেকবার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। ঘরে পয়সা নেই। শৈল আজ ২ মাস ধরিয়া মাথার অসুখে শয্যাগত। পোষ্টাফিসে কিছু টাকা ছিল, চিকিৎসায় খরচ হইয়া গিয়াছে। শৈল বলিতেছে আরো কিছুদিন যাক। মার মত যে এখন হইতেই রোজ না হোক দু একদিন অন্তর লোক না লইলে সংসার চলে না।

এই সংসার চলার কথা হইতেই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। শৈল বলে, 'যদি সুখ সোয়াস্তি না পেলাম, তবে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ, আমার অসুখ সারেনি, নাই বা চলল সংসার।' মা বলে 'অত যদি সুখের দিকে তাকাতাম আমি, তবে থাকতিস্ কোথায় আজ তুই?' শৈল উত্তর দেয়—'রেখে বড় উপকারই করেছ আমাকে।' মা বলে—'ঠিকই তো, বড় পাপ করেছি পরের মেয়েকে পুষে। পর আপন হয় না। শেষ বেলায় কষ্ট আমাকে পেতে হবে জানতামই তো।' অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ শৈল সইতে পারে না। কঠিন উত্তর দেয়। কথায় কথা বাড়িয়া চলে। উভয়পক্ষে তীব্র তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ, পরস্পর আমরণ মুখ না দেখার প্রস্তাব ঠিক হইয়া ঝড়ের পরে সাগরের বুকের মতো, ঘরের হাওয়াটা স্তব্ধ হইয়া আছে।

শৈলর প্রসাধন শেষ হইয়া গিয়াছে। গাড়ি আসিবার আর দেরি নাই। গাড়ি আসে রাত্রি ৮টায়, ষ্টীমার ছাড়ে রাত্রি ১টায়। এইটুকু সময়ের মধ্যে যা লোকজন আসে। পাশের বাড়ি হইতে হারমোনিয়মের আওয়াজ, তবলার সঙ্গত আসিতেছিল। প্রস্তুত না দেখিয়া কেউ ফিরিয়া গেলে সে রাত্রির মতো সকল আশা নষ্ট।

ঘরে পাশাপাশি দুখানা খাট। একখানাতে তার বিছানা। পরিষ্কার সাদা চাদরে ঢাকা। একটা নীলরঙের সোনালী ঝালর দেওয়া মশারী উঠানো রহিয়াছে, তারি পাশে আর একখানি বড় খাট, শীতলপাটি পাতা কয়েকটি তাকিয়া সাজানো রহিয়াছে। মাঝখানে সাজানো পানে ভরা ডিবা। মেঝের উপর কয়েকটি বড় কাঠের বাক্স। এককোণে একটি আলনা। কয়েকখানা সাদা শাড়ী কোঁচানো ও ভাজকরা রঙীন শাড়ী ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে নানা রকমের ছবি, একটা ইংরাজী কাগজ হইতে Princess Maryর ছবি ছিঁড়িয়া লাগানো হইয়াছে। তারি পাশে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। তা ছাড়া ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকখানা বিলাতী অর্দ্ধ-বিবসনার ছবিও আছে। একদিকের দেওয়ালে একখানা আয়না ঝোলানো, তারি সাম্নে দাঁড়াইয়া শৈল চুল পরিতেছিল, এমন সময়ে মা ওরফে নিভাননী ঘরে ঢুকিল।

নিভাননী কহিল "এই যে শৈল, কাপড় চোপড় পরা হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম বুঝি শুয়েই বা পড়লি ; তা

আজ যদি শরীর ভালো না থাকে, তবে নাই বা নিলি লোক।"

শৈল ঔদাসীন্যের স্বরে কহিল—"না আমি বেশ আছি। গাড়ি আস্‌ল বলে, তুমি যাও তোমার কাজে।" নিভাননী আসিয়াছিল, খানিকটা অনুতপ্ত হৃদয়ে শৈলকে শান্ত করিতে। নিজের পেটের মেয়ে না হইলেও ছোট বেলা হইতে তাহাকে মানুষ করিয়াছে। চিরজীবন সুখে কাটাইয়া এই শেষ বয়সের কষ্ট তাহার সহিতেছে না। তাই জানিয়া শুনিয়াও অনেক সময় নির্দ্দয় তাহাকে হইতে হয়। যৌবনে তাহার রূপ অনেক ছিল, কিন্তু স্বভাবটি মধুর কোনো দিন ছিল না। তাই যে অভিপ্রায়ই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া থাকুক না কেন—এই 'যাও তোমার নিজের কাজে' শুনিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেল। কহিল—"দিন দিন যেন তোর চক্ষুশূল হচ্ছি। এলাম দেখতে কী কচ্ছিস্—কেনরে, যাব কোথায়? আর যাবইবা কেন, একি তোর বাড়ি?"

শৈল আজ ঝগড়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল। বিরক্তিতে তার মন এত ভরা ছিল, যে আর কথা কাটাকাটি করার মতো রুচিও তার ছিল না। তাই তেমনি শান্তভাবে বলিল "তোমার বাড়ি।"

ঝগড়া পাকাইবার উৎসাহে ঝঙ্কার দিয়া নিভাননী কহিল "তাই যদি জানিস্, তবে যেতে বলিস কোন্ লজ্জায়?" শৈল কহিল "তুমি রান্না কচ্ছিলে, সেখানে যেতে বলেছি, চারু হয় তো এতক্ষণ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দোষ হয়ে থাকে মাপ করো।"

শৈলর এই অস্বাভাবিক নম্রতার কাছে নিভাননী পরাস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল এমনি সময়ে একজন যুবক ঘরে ঢুকিল। মুহূর্ত্তে শৈলর চোখে মুখে অন্যভাব দেখা দিল। হাসিয়া কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া কহিল "নমস্কার। আসুন",—নিভাননী আধ হাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গেল।

২

যুবক কহিল—"আজ রাত্রিটা এখানে কাটাতে পারি?" শৈল পাশে একটু দূরে আসিয়া বসিল ও উত্তর দিল "ভোরের ষ্টীমারে যাবেন বুঝি?" যুবক কহিল "ও, ভোবে একটা ষ্টীমার আছে নাকি, সেইটাতেই যাব তা হলে।"

"গান বাজনা হবে কি, তা হলে হারমোনিয়মটা আনি।"

"না আমি বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমোতে চাই।"

শৈল উচ্চস্বরে হাসিয়া কহিল—"তাই বুঝি ঘুমের সাথী একজন চাই, কী কপাল আমার। এ সুদৃষ্টি আমার উপর পড়েছে।" যুবক রসিকতা কবিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"পথের পাশেই বাড়ি, প্রথমটা পেয়েই ঢুকেছি। তখন কিছু বুঝিনি। এখন দেখছি কী শুভক্ষণেই যাত্রা করেছিলাম। না হলে এত রূপ হয়তো চোখে পড়ত না।" শৈল আর একটু কাছে আসিয়া বসিল। দেখিতে সে সুশ্রীই ছিল, কিন্তু সে রূপে কিছু অলৌকিকত্ব ছিল না। আর তার মা তাকে সাজগোজ

করিতে শিখাইয়াও ছিল। সত্য হউক মিথ্যা হউক স্ত্রীচিত্ত প্রশংসার লোভ ছাড়ে না, কহিল—"সোনার চোখ আপনার, আর কেউতো এ কথা বলেনি।"

কথাটা সত্য নয়। ইয়ারমহলে তার রূপের ব্যাখ্যা অনেক হইয়া গিয়াছে। তবুও এভাবে কথাটা তুলিলে স্তুতিবাদ আর কিছুক্ষণ চলিবে।

যুবক উত্তর দিল—তাদের চোখ নেই।

শৈল কহিল—কেন?

—সত্যই আপনি সুন্দরী।

—আপনার স্ত্রীর চেয়েও?

—আমার স্ত্রী নেই।

—কেন বিয়ে হয় নি?

—না।

"এ তো বড় নূতন কথা, জানেন বাবু—আমি দেখি যারা আসে তাদের সকলেরই ছেলে পরিবার আছে। বিয়ে হয়নি এমন কেউ বড় আসে না। তার কারণ একটা আমি ভেবে ঠিক করেছি, যাদের হয় নি, তারা ভাবে সব সুখ ওতেই পাবে। আর যাদের হয়েছে, তারাই দুদিক দেখে নিরাশ হয়ে সুখ খুঁজতে আসে। যাক সে কথা। কিছু আনব কি? ষ্টিমারে হোটেলে ভালো বিলিতি মদ পাওয়া যায়।"

"না, আজ আর নয়। আবার যখন এ পথ দিয়ে যাব—"

"—আর কি দেখা হবে, সকলেই তো ঐ বলে যায়। কেউ কেউ গিয়ে চিঠিও দেয় দু'একখানা। তারপর কে কার—"

তারপর স্বর ঈষৎ নামাইয়া ব্যথায় ভরিয়া দিয়া কহিল—“মেয়েমানুষ কিন্তু কখনও ভোলে না—”

এবার যুবকের মুখে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, “সত্য ?”

এই হাসি যেন শৈলকে ঝাঁকানি দিয়া জাগাইয়া দিল। এ রঙ্গরস আর কতক্ষণ চলিবে। দোকানদারের লাভের কথা ভুলিলে ব্যবসা চলে কই। তাই কহিল—“একটু বসুন, আমি ঠিক করেনি সব।”

অপরিচিতের সঙ্গে সারা রাত্রি বাসের মধ্যে আশঙ্কা অনেক আছে। এ ভাবে কত খুন, চুরির কথা সে শুনিয়াছে। তাই হাতের চুড়ী বাদ দিয়া সকল গহনা খুলিল—বলিল—“শুলে এগুলোতে যা লাগে।” বাক্সে তালা দিয়া পাশের ঘরে মাকে চাবি দিয়া আসিল। তার পর চুল খুলিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য একটা সাদা শাড়ী লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

এই লজ্জাটুকু যুবকের বড় মিষ্ট লাগিল। সে দেয়ালে বিচিত্র রকমের ছবির সংমিশ্রণ দেখিয়া আপন মনে হাসিতে-ছিল। শৈল ঘরে আসিয়া কহিল “হাস্‌ছেন যে ?”

যুবক কহিল—“আপনার রকম বেরকমের ছবি দেখে—”

শৈল উত্তর দিল—“কেন বেশ তো ছবি। আপনার পছন্দ না হয়, ভালো ছবি কিছু কিনে দিয়ে যান না। দাসী মনে রাখ্‌বে।”

যুবক কহিল, “না—তা নয়। আমি ভাব্‌ছিলাম স্বামী

বিবেকানন্দের কথা—কী দৃশ্যই তাকে দেয়াল থেকে দেখতে হয়। আর কী কথাই শুন্‌তে হয়—"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"কে বিবেকানন্দ।" যুবক তাঁর পরিচয় দিল। শৈল একটা শক্ত উত্তর দিতে যাইতেছিল। কী একটা মনে পড়িয়া কহিল—"মূর্খ মেয়ে, অত কি জানি? এক ভদ্রলোক ফেলে গেছ্‌লেন, টানিয়ে রেখেছি"—তারপর একটু থামিয়া কহিল—"আমার কিছু বখ্‌শিশ্‌ কি মিল্‌বে এখুনি?"

"—ও, তাইতো—" বলিয়া যুবক, মনিব্যাগ খুলিয়া একটা দশ টাকার নোট দিল। শৈল এত আশা করে নাই। কিন্তু সে কম মূল্যের সামগ্রী, এও সে জানাইতে প্রস্তুত নয়। তাই একটু হাসিয়া টাকা লইয়া মার কাছে গেল।

—ফিরিয়া আসিয়াই কহিল—"স্বামীজির কষ্টের কথা যদি এতই ভাবেন, তবে এলেন কেন এখানে?" বলিয়াই যুবকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল—"আর না, আমায় আর আপনি বল্‌বেন না। বলুন 'তুমি'।"

যুবক কহিল—"তুমি—"

"কী লক্ষ্মী ছেলে, এবার গায়ের জামাটা ছেড়ে ফেলুন, আমি দরজা দি। আপনার কথায় বড় কষ্ট পেয়েছি, আমরা কি এতই ঘৃণার জিনিস?"

"না না সত্যি, অত ভেবে আমি বলিনি, না, না ছি ছি কাঁদবেন না।"

ভিজে চোখের পাতা তুলিয়া কহিল—"আবার 'কাঁদবেন' না?"

যুবক কহিল—"কেঁদো না, ঘৃণার পাত্রী যদি ভাবব, তবে আসব কেন ?"

যুবক জামা ছাড়িতে উঠিল। মুখ ফিরাইয়া শৈল খানিকটা হাসিয়া লইল। ব্যবসায়ে সে নিপুণ—হাসি চোখের জল ইচ্ছামত আনিতে থামাইতে পারে। এককালে ছিল যখন ইতর রসিকতা লোকে পছন্দ করিত। এখনকার দিনে, সময়ে সময়ে বিষণ্ণ আনমনা ভাব, লজ্জা, কথাচ্ছলে এ জীবন বহিবার ব্যথা,—এ সব দেখাইতে পারিলে পশার বাড়িয়া ওঠে। ব্যবসায়ের পদ্ধতি বদ্‌লাইয়াছে। নিভাননীর সেকালের কৌশলে একালে কাজ হয় না। তাছাড়া ক্রেতাকেও চেনা চাই।

শৈল বাতি নিভাইয়া দিল।

৩

ক্লান্তিতে যুবকের চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। ২।১টা সাধারণ কথা কহিয়াই পাশ ফিরিতেই শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নামটা কী।" যুবক উত্তর দিল "নরেশচন্দ্র বসু, নাম দিয়ে কী করবে তুমি ?" "একটা আশ্চর্য্য লোকের নাম মনে রাখ্‌তাম" বলিয়া শৈল হাসিয়া উঠিল। নরেশ কহিল "কেন ?"—শৈল উত্তর দিল, "এই ধরুন যারা হোটেল ছেড়ে আমাদের মতো লোকের বাড়িতে শুধু ঘুমুতেই আসে।"

বস্তুতঃ নরেশ কী জন্য আসিয়াছিল তার জন্য শৈলর

মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু প্রতি অতিথিকেই সে এমন খুসী করিতে চেষ্টা করিত, যে একদিনে তাহারা তাহাকে না ফুরাইয়া ফেলে। তাই বোধ হয় অনেকের চেয়ে তার পুরাতন বন্ধুর সংখ্যা বেশি ছিল। শৈল দেখিয়াই বুঝিয়াছিল এ ধনী, এ পথে হয়তো যাওয়া আসাই করে। আজকার পরিচয় না পাকিতেই যদি কাল ভোরে ষ্টীমার ছাড়িবার সাথে সাথে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কারবারে একটা মস্ত লোকসানের কথা।

"না শুধু ঘুমুতে আসিনি, তবে চোখ যেন আর মেলে রাখতে পাচ্ছি না," বলিয়া শৈলর হাতটা হাতে টানিয়া কহিল "—তুমি কে, কেন এ ব্যবসা নিয়েছ?"

অন্যদিন হইলে শৈল একটা সরস উত্তর করিত—বলিত, "তা না হলে তোমার সাথে দেখা হত কী করে?" আজ সারাদিন মায়ের সাথে ঝগড়া করিয়া নিজের জীবনের কথা তার অনেকবার মনে হইয়াছে। তার অতিথিটিও কিছু স্বতন্ত্রশ্রেণীর লোক। তাই উত্তর দিল—"সে সব কথায় কী হবে।" নরেশ বলিল—"জান্‌তে ইচ্ছে হয়।" শৈল উত্তর দিল "কেন।" নরেশ কহিল—"কারণ আমার মনে হয় আমি স্ত্রীলোক হলে ভিক্ষে করে খেতাম। তবু এ পথে আসতাম না।" শৈল কহিল "ভিক্ষা করতে যাব কেন, ভিক্ষার বয়স যখন আস্‌বে, আপনি পথে বেরোব।"

এ আলোচনা প্রীতিকর হইতেছে না দেখিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাড়ি কোথায়? বিয়ে হয়েছিল?"

শৈল বলিল—'বাড়ি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে। ছোটবেলা থেকে এমনি, তা আমায় বিয়ে করবে কে? দুঃখ দেখে আপনি যদি না করেন—"

—বাড়িতে কে আছে?

—বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা।

—তোমার মা সেখানে থাকেন না কেন।

—আমার মা আমাকে প্রসব ক'রে মারা যান। তিনি বাবার স্ত্রী ছিলেন না, দুজনে প্রতিবেশী ছিলেন, আমার বাবার নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়েরা আছে।

—সেখানে থাকো না কেন?

—রাখলে তো। মা ছিলেন সদ্গোপ, বাবা ব্রাহ্মণ, জন্মাবার পরেই যাকে তখন দেখ্‌লেন, ওর কাছে বাবা দিয়ে যান। ওই মানুষ করেছে।

—বাবার সঙ্গে দেখাশুনা হয়?

—না, একবার দেখা করতে গেছলাম। তিনি করলেন না। আমার ছোটভাইএর বিয়ের সময় কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া খোঁজ খবর নিতেও চান না, দিতেও চান না।

—তোমার এ মা-টি কে?

—আমি যা, ইনি তাই ছিলেন।

—একটি ছোট মেয়েকে দোরের কাছে দেখে এলাম, ওই বা কে?

—ওকে আমি পালন কচ্ছি।

—তুমি বুঝি পরে ওর মা হবে, আর ও তোমার আসন নেবে।

—হ্যাঁ, অনেকটা তাইই।

—কেন এই নিরীহ মেয়েটির সর্ব্বনাশ করছ?

—সর্ব্বনাশ কিসের?

—তোমাদের এ জীবন কি সুখের?

—সুখতুঃখ বুঝি না, আর কোনো রকম জীবন কখনো জানি না তখন এতে তুঃখের কিছু আছে কিনা, তাও বুঝি না," বলিয়া শৈল যে দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিল, সেটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম নয়। পরে নানা রকম প্রশ্নের উত্তরে জানাইল—এটা তার মারই বাড়ি, সমস্ত আয় তার মাকে দিতে হয়। বারো তেরো বৎসরে প্রথম যখন এ ব্যবসায়ে ঢোকে, তখন ভালো লাগিত না বলিয়া কত মার খাইতে হইয়াছে, অনাহার সহিতে হইয়াছে।

সকল পূর্ব্বতুঃখ আজ তার মনে জমা হইয়া উঠিয়াছিল। কারো কাছে খানিকটা বলিতে পাইয়া তার মন যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল। গল্পে রাত্রিও অনেক হইয়াছিল, শৈল বলিল, "যদি ভোরের ষ্টীমার ধরতে চান, তবে এই বেলা ঘুমোন, খুব ভোরে জাগিয়ে দেব আমি।"

"তাই দিও", বলিয়া যুবক বাঁচিয়া গেল। ঘুম—কত যুগের হারানো নিদ্রা, কতদিনের ক্লান্তি তার চোখ জুড়িয়া আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টা তুয়েক পরেই শৈল ডাকিল—"নরেশবাবু।" তুএকবার

ডাকিতে ও ঠেলাঠেলি করিতেই নরেশ জাগিয়া কহিল, "ষ্টীমারের সময় হয়েছে নাকি?"

শৈল কহিল, "না, তা নয়। আমার মাথার অসুখ আছে, আবার বোধ হয় হল। খাটের নীচে আলো আছে জ্বালুন, মাকে ডাকুন।"

নরেশের নিজের কাছে দেশালাই ছিল। আলো জ্বালিয়া খাটের উপর উঠাইতেই দেখিল যন্ত্রণায় স্ত্রীলোকটির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে ও সে ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়িতেছে। নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"ঘরে জল আছে কোথায়ও",—আর উত্তর পাইল না। দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই শৈল সংজ্ঞা হারাইল।

শিয়রে বাতি রাখিয়া, নরেশ পাশের ঘরে গিয়া নিভাননীকে জাগাইল। 'মেয়েটার আবার হল' বলিয়া নিভাননী নিদ্রালসচরণে ঘরে ঢুকিল। কহিল—"তাই তো কী করি।" নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কাছে ডাক্তার আছে?" নিভাননী বলিল, ষ্টেশনের কাছে আছে। কিন্তু সে অল্প টাকায় এ রাত্রিতে আসিবে না।

"টাকার কথা তুমি ভেব না, ডেকে নিয়ে এসো। আর একটা আলো থাকে তো, জ্বালিয়ে নিয়ে যাও।"

সে সুরে একটা কর্ত্তৃত্বের ভাব ছিল। নিভাননী হতবুদ্ধি হইয়া নরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া, আলো জ্বালাইয়া বাহির হইয়া গেল।

নরেশ জল সংগ্রহ করিয়া শৈলর চোখেমুখে দিল। পরে মাথার কাছে ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার লইয়া নিভাননী ফিরিল। ঈষৎ ঘৃণা ও বিদ্রূপের স্বরে তিনি নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুব মদ টদ্ খেয়েছিলেন বুঝি।"

নরেশ কহিল, "না একেবারেই খাইনি।"

ডাক্তার দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

৪

তার পর পনর দিন ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম। শৈলর কখনো একটু জ্ঞান হয়—নরেশকে আপন-লোকের মতো হুকুম করে, 'তুমি' বলে। কখনো প্রলাপ বকে, কখনো চেতনা হারায়। নিজের খাওয়া ও স্নান করা ছাড়া বাকি সময় নরেশ তার কাছে থাকিত। রাত্রিতে পালা করিয়া নিভাননী ও সে রোগিণীর পরিচর্য্যা করিত। ইহার মধ্যে নিভাননীর সাথে সে খুব ভাব করিয়া লইয়াছে। প্রচলিতপ্রথামত তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকে। ঠাট্টা করে। নিভাননী তাহাকে রাঁধিয়া দেয়। তার স্নানের জল আনে। আর মাঝে মাঝে বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকায়—কেনই বা এতদিন রহিয়াছে, চিকিৎসার খরচ দিতেছে। অথচ মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না, কারণ এ অতিথি চলিয়া গেলে, সে একেবারে নিঃসহায়। তাই ভাবিত যেই

হোক, যে কারণেই থাক্, যতদিন ইচ্ছা থাকুক অন্তত: শৈল যতদিন না সারিয়া ওঠে। তা ছাড়া লোকটিকে তার লাগিয়াছিল ভালো। এ পর্য্যন্ত যাহারা আসিয়াছে তার বিগত যৌবনের দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। শুধু নরেশই সময়ে অসময়ে তার চুলের, রঙের ব্যাখ্যা করিয়াছে। বলিয়াছে মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিলে মাসীর বয়স ৩৫এর বেশি কোনোমতে বলা যায় না, রান্নাতে মাসীর মতো কেউ নাই ইত্যাদি।

মাসখানেক পরে শৈল একটু ভালো হইয়া উঠিয়াছে। নিভাননী সবে বাজার করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, নরেশ বারান্দায় বসিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিল, কী মাসী ফিরলে ?

নিভাননী কহিল, হাঁ, সব জিনিসের দর এত চড়ে গেছে যে আজ তোমার টাকা থেকে একটা পয়সা বাঁচল না।

নরেশ হাসিয়া কহিল—যাই বলো, তুমি ঠিক মালিনী মাসী হতে পারোনি। ছোটবেলায় যাত্রায় শুনেছিলাম তার বেসাতির হিসেব—

যাত্নমণি এই বেলা নেও হাটবাজারের হিসেব ক'রে
দিয়েছিলে তিনটি সিকি,
তুটি কানা। একটি মেকি
আমি তোমার এমনি মাসী, এনেছি সব ফিকির করে।

তুমি ফিকির জানো না লোকে তোমার কাছ থেকে পয়সাই নেয়।

নিভাননী এক গাল হাসিয়া কহিল—না গো না, দিন

যখন ছিল, তখন ফিকির করে আনতে আমিও পারতাম। আর আনতে হত না, বাড়িতে দিয়ে যেত।

সে কি মাসী, ও কী বলো, দিন তোমার এখনো যায়নি।

—কী মিষ্টিমুখ বাছার আমার, বলি তোমার বিয়ে কেমন আছে ?

—কথাটা বলিতেই নরেশের মনে পড়িল, শৈলকে সন্ধ্যের ঔষধ দেওয়া হয় নাই। সে ঘুমাইয়াছিল, নরেশ ভাঙ্গায় নাই।

'দেখি', বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে শৈল জাগিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—

কেমন বোধ কচ্ছ, শৈল।

—অনেকটা ভালো।

তবে কাল উঠে একটু পায়চারি কোরো। আমি একটু বসব কাছে, গল্প করব ?

না, তুমি তো দিনরাতই ঘরে থাকো, একটু বেড়িয়ে এসো পদ্মার ধার দিয়ে।

শৈলর জ্ঞান হইতেই অনেক প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে। কেন এই অপরিচিত লোকটি এত শুশ্রূষা করিতেছে, এতদিন যায়নি কেন।

এ সব জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি তার এতদিন হয় নাই। আজ নরেশ বাহির হইতেই শৈল ডাকিল, 'মা'।

'আসি' বলিয়া নিভাননী চারুকে লইয়া ঘরে আসিল। তার পর মাতা ও কন্যায় অনেক কথা হইল।

৫

কিছুদিনের মধ্যে শৈল সুস্থ হইয়া উঠিল। নরেশ তবুও তাহাকে কোনো পরিশ্রম করিতে দেয় না। রাত্রিতে গল্প করিয়া ঘুম পাড়ায়। পরে পাশের বিছানাতে তাকিয়া মাথায় দিয়া আপনি ঘুমাইয়া পড়ে। দ্বিপ্রহরে পাটী পাতিয়া শৈলর সঙ্গে বিন্তি খেলে শুধু বলে না কবে যাবে।

সেদিন সকালে শৈল স্নান করিয়া আসিয়া বলিল, "মা আমি আজ রাঁধব।"

নরেশ কহিল—"না, তুমি আবার আগুনের কাছে যেওনা।"

শৈল সে কথায় বিশেষ কান না দিয়া কহিল—"আমি ভালো হয়ে গেছি, আর চিরদিন দাসদাসী আমায় কে রেখে দেবে। মা, নরেশ বাবুর জল আজ একটু দেরিতে তুলে দিও। রান্না শেষ হতে দেরি হবে।"

নরেশ কিছু করিবার নাই দেখিয়া ষ্টেশন হইতে খবরের দুতিন রকম কাগজ আনাইয়া পড়িতে বসিয়া গেল। সব শেষ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি শেষ করিতেছে, এমন সময় শৈল আসিয়া কহিল—"স্নান করুন।"

'করি' বলিয়া নরেশ উঠিয়া গেল। শৈল ঘরে তার খাবার জায়গা করিতে লাগিল।

সেদিন বহুরকমের রান্না, পাশে বসিয়া শৈল পাখা করিতেছে। নরেশ কহিল "এত আয়োজন?"

শৈল বলিল—"আর আপনার যাবার সময় তো হয়ে এল, এত করলেন আমার জন্যে, এক দিন ভালো করে খাওয়াতেও পারলাম না।"

নরেশ কথার ইঙ্গিতটা বুঝিল। বলিল, "ঠিক কথা মনে করেছ শৈল। এখান থেকে একটা ষ্টীমার কাছাড় অবধি যায়, প্রতি মঙ্গলবারে ছাড়ে। আসছে মঙ্গলবারেই যাব।"

শৈল কহিল—"কেন যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যাবেন না?" নরেশ বলিল—"না সেখানকার কাজ আর এখন হবে না। তোমার অসুখ হল। ভাবলাম তোমায় সুস্থ দেখে যাব। এখন একেবারে কাছাড়ই যাব।"

শৈল অনেক যত্ন করিয়া নরেশকে খাওয়াইল। কিন্তু আজ সকাল হইতেই তার সকল কথায় যেন একটু দূরদূর ভাব। নরেশ তাহাকে ভালোবাসে নাই। তবু এ অকৃতজ্ঞতায় যেন তাহাকে আঘাত করিল। যাইতে তাহাকে হইবেই তবুও কি কথাটা এই রকম করিয়া তোলা একান্তই আবশ্যক? অথবা এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাছে লোকের ব্যবহার ফুরাইলে আদরও ফুরায়।

আহারান্তে শৈল তাহার বিছানা পাতিয়া দিল। পরে মাথার কাছে পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিল।

—নরেশ বলিল—তুমি খাবে না?

—আপনি ঘুমোন, তারপরে আমি খাব।

—না, না, আমি দিনে ঘুমোই না, তুমি খেতে যাও, দেরি করে খেলে আবার অসুখে পড়বে।

—দিনে ঘুমোন না। কিন্তু রাত্রিতেও ঘুমোন না। আজ ২।৩ দিন থেকে আমি রাত্রিতে যখন জাগি, তখন দেখি জেগে এপাশ ওপাশ করছেন। বিশেষ খানও না, এই ক'দিনেই কী রোগা হয়ে গেছেন। তার উপর এক মাস ধরে আমাকে আগলানো।

—না আমি ঘুমেও পাশ ফিরি, বলিয়া নরেশ শৈলর মুখে চাহিয়া দেখিল—স্নানান্তে এলোচুলে পিঠ ঢাকিয়া গিয়াছে। একটি সাদা ব্লাউস ও একটি কালো পেড়ে সাদা শাড়ী। আজ প্রথম শৈলকে দেখিয়া মনে হইল অনুকূল অবস্থা হইলে সমাজ সংসারেও এ নারীকে মানাইত।

—কী ভাবছেন, বলিয়া শৈল একটু হাসিল।

—কিচ্ছু না।

—আমি বলতে পারি।

—কী, মনের কথা কবে গুণতে শিখলে।

—গুণ থাকলেই শেখা যায়। আপনি ভাবছেন, যাদের জন্য এত করলাম, তারা আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

—যদি তাইই ভেবে থাকি।

—না, তা নয়। মার কাছে শুনেছি আপনি আমার জন্য কী করেছেন। আপনি ফিরে যান, আপনার নিজের লোক-জনের কাছে। কেন এমন করে একটা বেশ্যার বাড়িতে থেকে, আর তার বুড়ি মার সঙ্গে ঠাট্টা করে নিজে নষ্ট হচ্ছেন।

—এতদিন পরে কি তোমার নিজের প্রতি ঘৃণা জন্মালো।

"সে কথা তো বলিনি—না আর কথা নয়। আপনি এবার চোখ বুজুন—দিন-দিন এমন অবাধ্য হয়ে উঠছেন কেন।"

বলিয়া পাখা ছাড়িয়া শৈল নরেশের চুলের ভিতরে আঙ্গুল বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—"না আর ঝগড়া করে না, ক'টা দিন বই তো নয়।"

নরেশ চোখ বুজিয়া অনেক রকম কথা ভাবিতেছিল। এতদিন শৈলর কথা সে ভাবে নাই। আজ বুঝিতেছিল যেমন করিয়াই হোক তার অন্তরের সুপ্ত নারীপ্রকৃতিকে সে জাগাইয়াছে। আর এই নারী অসম্ভবের আশা না করিয়া ভবিষ্যতের দুঃখ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্যই তাহাকে দূরে পাঠাইতেছে। এ চিন্তা তার মনে আনিল একটু সুখ, অনেকখানি বেদনা, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা।

চাহিয়া দেখিলে নরেশ দেখিত শৈলর চোখ-ভরা জল, বহু চেষ্টায় ঝরিতে দেয় নাই। সেই নিরুদ্ধ অশ্রুভারে চোখের পাতা দুটি কাঁপিতেছিল। নরেশ চাহিয়া দেখিল না। এ অনুভূতি শৈলর নূতন। লোকজন আসে যায়, সোহাগ করে, দাম দেয়। ভোরের বেলায় না মনে থাকে তাদের নাম, না মনে পড়ে তাদের মুখ।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় এ কোন অপরিচিত অতিথি অজানা সোনার কাঠি দিয়া তার অন্তরের রাজকন্যাকে জাগাইয়া দিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়াছে বঞ্চিত হৃদয়ের সঞ্চিত অনাদিকালের তৃষ্ণা। এই যে তার জন্য কেউ ভাবে, তার মঙ্গল চায়, নিজের অসুবিধা অর্থব্যয় করিয়া তার সুখের কামনা করে এ তার কাছে অতি নূতন। পুরুষকে সে এতদিন চাহে নাই। আজ তার সারা অন্তর চাহিতেছিল ঐ দৃঢ় বাহু বন্ধনের নিম্নে বিপুল বুকে একটি ক্ষুদ্র নীড়ে চিরদিনের জন্য বন্দী হইতে।

কেউ এ শিক্ষা তাকে দেয় নাই। তবুও তার মন বলিতে-ছিল এতদিন সে জীবনের বহির্দ্বারে ছিল, ভিতরের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সোনার ভাণ্ডারের চাবি কে আনিয়া দিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুক জুড়িয়া হাহাকার জাগিতেছিল—সকল বক্ষ খুলিবার তার অধিকার নাই। দূরে বনের বীথি দিয়া যে মহাসাগরের ছবি সে দেখিয়াছে, তাহাতে তরী সে ভাসাইতে পারিবে না। নিজের সর্ব্বনাশ না করিতে হইলে এখনি তাহাকে সাবধান হইতে হইবে। এই মুহূর্ত্তের আভাস, ক্ষণেকের পরিচয়, এই তার পাথেয়। লোভ করিয়া সে কষ্ট পাইবে না।

নরেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মহাজনের কারবারের মাঝে তার এই দানযজ্ঞ যে প্রলয় ঘটাইয়াছে, তার সকল কথা সে জানিত কি? বুঝিত কি যে, যে একদিন ছদ্মঅশ্রু দিয়া তার মন গলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, আজ কী প্রয়াসে সে সারা অন্তরভরা কান্না চাপিয়া রাখিয়াছে।

৬

সেদিন শুক্রবার রাত্রি। নরেশের যাওয়া ঠিক হইবার পর হইতে শৈল তাহাকে প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছে। ধনীর সন্তান নরেশের ভোগের অভাব কোনোদিন ছিল না। কিন্তু এখন যাহা পাইতেছিল, এ যে কত মহামূল্য সামগ্রী, এও তাহার অবিদিত ছিল না। শৈলর মুখ দেখিয়াই বুঝিত যেন তাহাকে যত্ন করিতে পাইয়া বিপুল সার্থকতায় তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে, শুধু থাকিয়া থাকিয়া মনে হইত শৈলর স্বভাব-চঞ্চল চোখে কোন নিগূঢ় বেদনা যেন এক অপূর্ব্ব শান্তশ্রী আনিয়া দিয়াছে। সে ভুলিয়া গিয়াছিল শৈল কী, কী সূত্রে তাহাদের আলাপ। শুধু তাহার মনে হইত এ নারী তাহার বহুপরিচিত, অত্যন্ত আপনার জন।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, নরেশ শুইয়াছিল, শৈল কাছে বসিয়াছিল, নিজের বিছানাতে যায় নাই। দুজনে অনেক গল্প হইয়া গিয়াছে। তার পর নরেশ বলিল—"এবার অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি শুতে যাও।" শৈল উত্তর দিল—"আমার ঘুম পাচ্ছে না, আর একটু বসি না ?"

"না আর নয়। সেদিন অসুখ থেকে উঠেছ, আবার রাত্রি জেগো না।"

"কিন্তু জাগতেই তো আবার হবে", বলিয়া শৈল একটু

হাসিল। কী ব্যথায় ভরা সে হাসি। নরেশ ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কেন জাগতে হবে? আর কি কোনো জীবিকার উপায় নেই?" তার পর শৈলর হাতখানি নিজের হাতে লইয়া কহিল "শৈল আমি যা দিয়ে যাব, তাতে তোমার বৎসরখানেক চলবে।" শৈল তেমনি উদাসীন কণ্ঠে উত্তর দিল—"তাতে লাভ? এক বৎসর না হয় চলল, ততদিন চেনা লোক অপর হয়ে যাবে। তার পরে আমার ভাবনা কে ভাববে, সেদিন তো তুমি থাকবে না?" তার পর বলিয়া উঠিল "না না, আর লোভ দেখিও না, আমি যা আমার তাই ভালো।"

সেদিন তো তুমি থাকবে না, কথাটাতে নরেশের সমস্ত অন্তর যেন কাঁদিয়া উঠিল। এমন করিয়া পৃথিবীর আর কেহ তাহার আশ্রয় চাহে নাই। কিছুক্ষণের জন্য সে সব ভুলিয়া গেল। শৈলকে বুকে টানিয়া কহিল, "শৈল যাবে আমার সাথে?"

সে কয়টি কথার মধ্যে—শৈলর অন্তরে কোন গোপন অশ্রু নির্ঝর জাগাইয়া দিল। নরেশের সে আলিঙ্গনে সে বাধা দিল না। আবেশে তাহার চোখ বুজিয়া আসিল। সমস্ত দেহের সঙ্গে জীবনের সমস্ত ভার যেন নরেশের বুকে সঁপিয়া দিল।

ধীরে নরেশ তাহার মুখখানি নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিল। পথ হইতে ছেঁড়া ফুল তুলিয়া মানুষ যেভাবে দেখে সেই বেদনামলিনমুখ সিক্তপল্লব, অর্দ্ধমুদ্রিত মুখখানি

দেখিয়া তাহার মন যেন সেইভাবে বলিয়া উঠিল—আহা কে ছিঁড়িল।

তাহার পর শৈলর মুখ নিজের বুকে রাখিল, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস নরেশের সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ জাগাইতে লাগিল। সেই পুষ্পপেলব সুরভি অধর দুটি যেন ঈষৎ কাঁপিতেছিল, নরেশ টানিতেই শৈল তাহার মুখখানি চুম্বনের আশায় নরেশের মুখের কাছে আনিল।

নরেশ চুম্বন করিল না। আবার কহিল "যাবে আমার সাথে ?" এ স্বর্গের অনুভূতি কথা বলিয়া শৈল ভাঙ্গিতে চাহিল না, কিন্তু নরেশ আবার প্রশ্ন করায় তেমনি বুকে মুখ রাখিয়া কহিল—"যাব।"

নরেশ বলিল, "কিন্তু কোথায়, বলো তো ?"

শৈল নরেশের বুকে মুখ আরো গুঁজিয়া কহিল—"তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু তোমার মা।" শৈল উত্তর দিল—"তুমি তাঁকে খরচ পাঠিও।"

রাত্রিশেষে নরেশ শৈলকে ডাকিয়া কহিল "শৈল ঘুমচ্ছ।" আজ সে স্বেচ্ছায় শৈলর বিছানাতে আসিয়াছে। শৈল জাগিয়া কহিল, "হাঁ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেন আগে জাগালে না ?"

সুখে তাহার হৃদয় ভরিয়া ছিল। বাসরে নববধূর মতো তাহার স্বরে, ব্যবহারে যে সলজ্জ বাসনা ফুটিয়া উঠিতেছিল

তার মতো মধুর সংসারে আর কিছু ছিল না। নরেশ, তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল—"শৈল তুমি আমার সত্য পরিচয় জানো না, অনেক কথা তোমায় আজো বলতে পারব না, কিন্তু কিছু না বললে হয়তো তোমাকে প্রতারণা করা হবে। তাই বলি—"

শুনিয়া শৈলর বুক যেন ক্ষণেকের জন্য কী আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। কহিল—"আমি কিছু জানতে চাই না, আমার দেবতা তুমি। আর আমায় ছেড়ো না। কোন্ জন্মের পুণ্যের ফলে তোমার দেখা পেয়েছিলাম।"

"না শৈল, তোমাকে শুনতে হবে। আমি তোমার কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলেছি। বলেছিলাম আমি বিবাহিত নই। সে মিথ্যা, আমার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী নেই।"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"মারা গেছেন?"

নরেশ কহিল—"হাঁ, কিন্তু সে কাহিনী অত সংক্ষিপ্ত নয়; সে সব কথা আমার আর মনে করতেও ইচ্ছা হয় না। আমার বিবাহের অল্প পরেই আমি আর একটি বিবাহিতা মহিলাকে ভালোবেসেছিলাম।" বলিয়া নরেশ থামিল। শৈল কোনো উত্তর দিল না। নরেশ আবার কহিল—"আমার স্ত্রীর উপর আমি কোনো অত্যাচার করি নি, কিন্তু আমি যে অন্যের প্রতি আসক্ত, সে কথা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে তিনি জানতেন। পরে তাঁর ডায়েরী পড়ে বুঝেছি যে আমার কোনো ফাঁকি তার কাছে লুকোন ছিল না।

শৈল, তুমি হয়তো ভাববে যে আমি কী করে আর একজনকে বিশেষতঃ যে ভালোবাসে তাকে কষ্ট দিতে পারি। কিন্তু একজনের প্রতি ভালোবাসা আর একজনের প্রতি মানুষকে কী নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে, তা নিজে না জানলে আমিও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না।

তারপর যাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম, একদিন দেখলাম তার মতো অবিশ্বাসিনী সংসারে আর নেই। তারপরের দিনগুলি আমার কী ভাবে গেছে বলতে পারি না। কিন্তু আমি তাকে আজো ভুলতে পারি নি।

সেভাবে তাই আর কোনো নারীকে পারি না ভালো-বাসতে। আজ হয়তো আমার অনেক ব্যবহার তোমার কাছে স্পষ্ট হবে। কিন্তু কী করব, পারি না, কাউকে কাছে আনলে আমার মনে পড়ে তার মুখ। আজো বুঝতে পারি না অত রূপের মধ্যে অতখানি ছলনা অত কপটতা কী করে লুকিয়েছিল,—আজ তোমাকে বুকের কাছে এনে এতকাল পরে আবার সে সব মনে পড়ছে, সেও এমনি করে সাগরের ঢেউ-এর মতো আমার বুকে ঢলে পড়ত।”

শৈল জিজ্ঞাসা করিল—“তারই জন্য তুমি উদাসী?”

নরেশ কহিল, “না শৈল, আমি উদাসী নই। কয়েক বৎসর আমার জীবন যেন খালি হয়েছিল। কিন্তু নারীর ভালোবাসা ছাড়াও জীবনে অনেক বস্তু আছে। একদিন তার খোঁজ পেলাম।

সে আমার মা, কী করে তাঁকে ভুলেছিলাম জানি না।

কিন্তু তাঁকে জানবার পর তাঁর সেবা ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে আসে না। মা আমার রাজেন্দ্রানী, কিন্তু তবু তাঁর মতো দুঃখিনী এ পৃথিবীতে আর নেই হয়তো—"

"কেন তাঁকে আগে জানতে না?"

"জানতাম কিন্তু ভুলেছিলাম, কিন্তু আমার মায়ের ডাক যে একবার শুনেছে, পৃথিবীতে তার অন্য কর্ত্তব্য নেই। যেতে যদি চাও আমার সাথে, তবে আমার সেই ব্রতে যোগ দিতে হবে। স্নেহ তোমাকে না ক'রে পারি না, কিন্তু শৈল, ভালোবাসা এ জীবনে আর আসবে না।"—

শৈল সব কথা বুঝিল না, কিন্তু যেটুকু বুঝিল তাহাতেই তাহার স্বর্গ নিমেষে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই পুরুষ যাহার চিত্ত অন্যের স্মৃতিতে এখনো ভরিয়া আছে, তাহার কাছে তাহার কী প্রত্যাশা করিবার আছে। দুঃখিনীর প্রতি দয়া— শুধু তাই দিয়া তাহার সাধ মিটিবে কি? আজ সন্ধ্যায়, নরেশের বুকে মাথা রাখিয়া কি তাহারই স্বপ্ন দেখিয়াছিল? সে আর কথা না পাড়িয়া নরেশকে কহিল, "আর একটু ঘুমোও, কাল অনেক রাত্তির জেগেছ। কী হবে ও সব মনে করে।"

প্রভাতে নরেশ জাগিয়া দেখিল শৈল উঠিয়া গিয়াছে।

ঘরের দরজা জানালা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে —পাছে নরেশের ঘুম ভাঙ্গে।

মাথার কাছে দেখিল একরাশ বেলফুল। শৈল তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পাশের বালিশের উপর তু একগাছা শৈলর ছেঁড়া চুল।

ভোরের কোমল বাতাসে আজ যেন তার স্নায়ু শিথিল হইয়া আসিল। তুদিন পরে আবার জীবনের সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। আজ সব ছাড়িয়া পৃথিবীর এই নিরালা কোণটিতে শৈলকে লইয়া জীবন রচনা তার কাছে যেন অত্যন্ত লোভনীয় মনে হইতে লাগিল। এমন সময়ে শৈল খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"যে জন্য এত করলাম, তা হল না; ভেবেছিলাম অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোবে। এমন কি সেজন্য গলার স্বর উঁচু না করতে পেরে মার সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে গেছি, তবু এসে দেখি দিব্যি জেগে, কী ধ্যান হচ্ছে?"

শৈলর এই হাস্য পরিহাসে সমস্ত ঘরটা যেন মিষ্ট হইয়া উঠিল। নরেশ কহিল—"তুমি বুঝি খুব ঝগড়া করো—আমার সাথে কিন্তু ঝগড়া করতে পাবে না।"

"তুমি তো চলে যাচ্ছ, ইচ্ছে থাকলেই বা কী ক'রে করতাম।—আর তা ছাড়া এখনি উঠে মুখ ধুয়ে এগুলি না খেলে ঝগড়া একটা হবেই তো।"

নরেশ কহিল—"আমি চলে যাচ্ছি, আর তুমি—"

শৈল উচ্চ হাসিয়া কহিল—"আমি, আমি কোথা যাব। আমি গেলে আমার দারোগাবাবুর, ষ্টেশনমাষ্টারবাবুর,

আমার মার, চারুর এ সবের কী দশা হবে। আর আমি যে বস্তু, আমাকে নিয়ে রাখবেই বা কোথায় ?"

"সে ভাবনা আমার, কিন্তু তুমি যে কাল বললে তুমি যাবে আমার সাথে ?"

"ওরকম বলা আমার ব্যবসা,আমি যদি বলতাম যাব না, তাহলে কি মানাত ?—আমার অমন সুন্দর অভিনয়টা কেমন নষ্ট হয়ে যেত বলো দেখি, এতদিন দেখেও কি আমাকে চিনলে না ?"

"চিনেছি বলেই এ সব বিশ্বাস করতে পারি না শৈল। এসব কী বলছ বলো দেখি—"

"যা বলছি তা ঠিকই। এবার এগুলি খাও। দুদিন পরেই তো যাবে ভুলে, হরিপুরের জমিদার লক্ষ্মীবাবু কিছুদিন আমাকে দিনে দুখানা করে চিঠি দিতেন, বলতেন আমি তার নয়নের মণি। কিন্তু মণি ছাড়াও আজ কাল তিনি বেশ চোখে দেখেন। শুনছি এবার কলকাতায় তাঁর একটি সাগরের মণি জুটেছে। আমি রাঁধতে চললাম, খেও এসব, এসে যেন না দেখি কিছু পড়ে আছে", বলিয়া আবার হাসির লহর তুলিয়া শৈল বাহির হইয়া গেল।

বর্ষার পদ্মা কূল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। যাহাদের দোকান কূলের কাছে ছিল তাহারা কিছু দূরে নূতন ঘর

বাঁধিয়াছে। আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। থাকিয়া থাকিয়া প্রবল স্রোতে কূল ভাঙ্গিয়া পড়িবার শব্দ শোনা যায়। আঁধারে বিরাট সরীসৃপের মতো নদীর প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। দূরে একটি ষ্টীমারের Searchlight আঁধারের বুক চিরিয়া তাহার রশ্মিজিহ্বা বাহির করিতেছিল। নরেশ কূলে বেড়াইতেছিল।

আজ সকাল হইতে শৈলর যে মূর্ত্তি সে দেখিয়াছে, তাহা তাহার প্রথম দিনের পরিচয়ের সাথে খাপ খায় বটে। কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল, আজ তাহার এ অভিনয়। যে কারণেই হোক আপনার অন্তর আর সে তাহার কাছে ধরা দিতে চাহে না।

সংসারে একজনকে হারাইলে সব হারায়। এ কথাটা এমন করিয়া তাহার বুকে আগে কখনও বেঁধে নাই। কোনো বন্ধনই তাহার নাই। কিন্তু তবু এই নারীর সমস্ত প্রাণের পূজা লইয়া ছন্নছাড়া জীবন আবার সংসারের কোনো নিভৃত পথে আনিবার তাহার কী বাধা।

পুনঃ পুনঃ তাহার মন এই প্রশ্ন করিতেছিল। শুধু যাহা উত্তর, তাহা ভাবিবার শক্তি ছিল না। যে অদৃশ্য নারী তাহার বিপুল কেশে আজ তাহার আকাশ এমনি করিয়া ছাইয়া তাহাকে একাকী করিয়াছে যাহার বাসনার স্রোত এমনি করিয়া নিঃশব্দে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার সকল নিষ্ঠুরতা সকল বিশ্বাসহীনতা সত্ত্বেও কি সে এত প্রিয়?

সহসা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল সেই নিবিড় মেঘের দুই স্তরের মধ্যে একটি তারা জ্বলিতেছে—এ যেন তাহারই কপালের সিন্দূর বিন্দু। এমনি সন্ধ্যায় একদিন নদীর বুকে তাহার কপালে সিন্দূর পরাইয়া বলিয়াছিল—আমার সন্ধ্যাশ্রী।

আজ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরেও সে যদি তেমনি হাসিমুখে আবার আসে, সেই স্থির চঞ্চল চোখে যদি তেমনি চায়, বাতাসে যদি তাহার আঁচল তেমনি কাঁপায়।

তারপর বাহুর নাগপাশ দিয়া যদি তেমনি বাঁধে, নিশ্বাসের আগুন দিয়া তেমনি জ্বালায়, সে কোমল বুক দিয়া তেমনি তীব্র আঘাত করে। সে এলোচুলে যদি জাগে সে তড়িৎস্পর্শ,—কোথায় থাকিবে তখন শৈল আর তার দুঃখ, মাতৃভূমি আর তার সেবা।

৯

"কী রে শৈল,আছিস্ কেমন"—বলিয়া থানার দারোগা বাবু ঘরে ঢুকিলেন। খাটে বসিয়া কহিলেম—"আসতে পারিনি এতদিন। প্রথম গেলাম ডাকাতের তদন্তে; তারপর হল ছোটমেয়েটার অসুখ, তারপর সকলকে বাড়ি নিয়ে গেলাম, তাই কি ছুটী মেলে, চাকরী না দাসত্ব, বলি সত্যি কেমন আছিস্ শৈল ?—"

শৈল নরেশের ফিরিবার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু দারোগাকে অসন্তুষ্ট করিবার সাহস তাহার ছিল না, বলিল,—"যেমন রেখেছেন। এতদিনে মনে পড়ল বুঝি!"

"তবে এতক্ষণ বললাম কী রে, বলি তোকে কি পারি ভুলতে, একটা গান শোনা না?"

"হারমোনিয়মটা নেই ভালো,আর একদিন শোনালে হবে না?" বলিয়া শৈল ভীত চোখে চাহিল।

"অভাগা যগুপি চায়, সমুদ্র শুকায়ে যায়। আচ্ছা, তাইই শোনাস, আজ একটু কাজও আছে।"

এমনি সময় নরেশ ঘরে ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। দারোগা ডাকিয়া কহিলেন,"আরে বসুন বসুন, নে শৈল, আর কেউ আসছে একথা আগে বল্‌লেই পারতিস্," বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নরেশের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন ভোরে শৈল সবে উঠিয়াছে এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া একটি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি দারোগার নিকট হইতে। এখনি ষ্টেশনের waiting room এ তিনি শৈলর সাথে দেখা করিতে চান্।—আরো লেখা আছে—যেন শৈল একলা আসে।

নানারূপ চিন্তা লইয়া শৈল দেখা করিতে গেল। দারোগা আগে হইতেই উপস্থিত ছিলেন, দরজা ভেজাইয়া কহিলেন—"কপাল যখন খোলে শৈল, এমনি করেই খোলে, অনেক টাকা

তুইও পাবি, আমিও পাব, তা ছাড়া আমার উন্নতিও হবে।”
শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল—“কী বলছেন এসব”—

“বলছি সব খুলে”, বলিয়া দারোগা ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন—“আমি সব খোঁজ নিয়েছি, তোর বাড়িতে যে লোকটা আছে—তার ফটোগ্রাফও আছে আমার কাছে। জানিস আজ কাল রাজদ্রোহী ডাকাতদের, ও তাদেরই একজন, এই সপ্তগ্রামের ডাকাতি যার তদন্তে গিয়েছিলাম, তাতে ছিল। ২।৩টি লোক খুন করেছে। কলকাতায় ওদের বোমার আড্ডা আছে। ধরতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। এত সহজে খোঁজ পাব, ভাবিওনি।

তোকে যেমন যেমন বলছি, তেমনি করবি। আজ দিনের বেলায় আমি পাহারা রাখ্‌ছি, কোথায়ও যেতে পারবে না। রাত্রিতে আমি আসব। রাত্রি ১১টা আন্দাজ ছোট-বাবু লোকজন নিয়ে আসবে, আমি সন্ধ্যা বেলাতে এসেই ওর সঙ্গে মজ্‌লিশ করব। ওরা ভীষণ লোক, সঙ্গে বন্দুক পিস্তল ছাড়া চলে না, কৌশল করে ধরা চাই। বিশেষ চোখে চোখে রাখ্‌বি। কাল আমায় দেখেছে। পুঁটি আমার ঝি। সে আজ তোর বাড়িতে থাক্‌বে। কোনো কিছু গোল-মাল হবার সম্ভাবনা দেখ্‌লেই খবর দিবি। এখানে এসেছিস্‌ আর যা শুন্‌লি যেন কেউ না জানে। বুঝ্‌লি এবার ?”—

শৈল কহিল—“বাপরে বাপ্‌। এমন সাংঘাতিক লোক জান্‌লে কি বাড়িতে জায়গা দি’। আমি সব ঠিক্‌ করে রাখ্‌ব।—আর আমায় ছেড়ে ও কোথায়ও যাবে না।” দারোগা

একগাল হাসিয়া কহিল—"সত্যি নাকি, আর তোর ফাঁদে না পড়ে কে? বদ্‌লী হলে কী করে বাঁচব তাই ভাবি," বলিয়া শৈলর চিবুকে হাত দিয়া কহিল—"যা এবার বাড়ি যা, খুব সাবধান যেন জানতে না পায়।

১০

ফিরিবার পথে শৈলর পা চলিতে চাহিল না। যাহার পায়ের অঙ্কুর তুলিবার জন্য হেলায় সে প্রাণ দিতে পারে তাহাকে পুলিশের কাছে ধরাইতে হইবে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মাথা ঘুরিতেছিল—ভয় হইল, আবার তাহার অসুখ হয়। তাহা হইলে নরেশের মুক্তির কোনো আশাই নেই। কখনও আশা করিতেছিল হয়তো ভুল,—যে মায়ের মতো রোগে তাহার সেবা করিয়াছে, সে করিতে পারে মানুষ খুন? কিন্তু নরেশের কথায় ব্যবহারে এমন কিছু অনেক সময় সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার অন্তর বলিতে লাগিল, দারোগার কথাই সত্য।

নরেশ জাগিয়া বিছানায় বসিয়া ছিল। আজ কেহ তাহার চা খাবার আনে নাই। কাল রাত্তিরে অন্য লোকের আসা, আজ সকালে এই অনাদর, এ সব তাহার মনকে ঈষৎ চঞ্চল করিয়াছিল। সত্যি কি এ পথে আসিলে নারী মনুষ্যত্ব হারায়। আবার ভাবিতেছিল, লোক আসিলে বারণ করিবার

কী শক্তি আছে শৈলর। চিরদিন একভাবে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার কাছ হইতে সতীর দর্প লোকে সহিবে কেন?

এমন সময় শৈল ঘরে ঢুকিল। দরজায় খিল দিয়া কোনো কথা না বলিয়া, নরেশের হাত দুটি ধরিয়া কহিল—"কেন বলো নি আমায় এতদিন, এতই কি পর আমি?"

নরেশ কিছু সন্দেহ না করিয়া, উত্তর দিল, "কী বলি নি শৈল?"

শৈল তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তাহাকে কহিল—নরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল—"সবি সত্যি শৈল। তোমাকে বলে-ছিলাম যে মাকে খুঁজে পেয়েছি। সে আমার দেশ, কিন্তু তুমি ভাবনা কোরো না। দারোগার সাধ্য নেই নিজের প্রাণ না দিয়ে আমাকে ধরায়।"

শৈল উত্তর দিল, "তাতে কী লাভ? ক'জনকে একলা মারবে তুমি? আর কী হবে মানুষ খুন করে? ভাবলে গা কাঁপে, তুমি পারো লোক মারতে! আমি যা ভেবেছি তাই ভালো।

দারোগা বলেছে সন্ধ্যায় মজলিশ্ করতে আসবে। সেই সময় তুমি পালাবে। আমি বলব বেরিয়ে গেছ, শীঘ্র আসবে। তুমি ছোট ঘরটীতে থাকবে। সে অন্ধকারে আর পাহারা রাখবে না। তখনকার ভার আমার উপর দিয়েছে। আমি তাকে গান বাজনায় ভুলিয়ে রাখব। ততক্ষণে তুমি গ্রামের রাস্তা ধরতে পারবে।"

একগাল হাসিয়া কহিল—"সত্যি নাকি, আর তোর ফাঁদে না পড়ে কে? বদ্‌লী হলে কী করে বাঁচব তাই ভাবি," বলিয়া শৈলর চিবুকে হাত দিয়া কহিল—"যা এবার বাড়ি যা, খুব সাবধান যেন জান্‌তে না পায়।

১০

ফিরিবার পথে শৈলর পা চলিতে চাহিল না। যাহার পায়ের অঙ্কুর তুলিবার জন্য হেলায় সে প্রাণ দিতে পারে তাহাকে পুলিশের কাছে ধরাইতে হইবে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মাথা ঘুরিতেছিল—ভয় হইল, আবার তাহার অসুখ হয়। তাহা হইলে নরেশের মুক্তির কোনো আশাই নেই। কখনও আশা করিতেছিল হয়তো ভুল,—যে মায়ের মতো রোগে তাহার সেবা করিয়াছে, সে করিতে পারে মানুষ খুন? কিন্তু নরেশের কথায় ব্যবহারে এমন কিছু অনেক সময় সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার অন্তর বলিতে লাগিল, দারোগার কথাই সত্য।

নরেশ জাগিয়া বিছানায় বসিয়া ছিল। আজ কেহ তাহার চা খাবার আনে নাই। কাল রাত্তিরে অন্য লোকের আসা, আজ সকালে এই অনাদর, এ সব তাহার মনকে ঈষৎ চঞ্চল করিয়াছিল। সত্যি কি এ পথে আসিলে নারী মনুষ্যত্ব হারায়। আবার ভাবিতেছিল, লোক আসিলে বারণ করিবার

কী শক্তি আছে শৈলর। চিরদিন একভাবে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার কাছ হইতে সতীর দর্প লোকে সহিবে কেন?

এমন সময় শৈল ঘরে ঢুকিল। দরজায় খিল দিয়া কোনো কথা না বলিয়া, নরেশের হাত দুটি ধরিয়া কহিল—"কেন বলো নি আমায় এতদিন, এতই কি পর আমি?"

নরেশ কিছু সন্দেহ না করিয়া, উত্তর দিল, "কী বলি নি শৈল?"

শৈল তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তাহাকে কহিল—নরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল—"সবি সত্যি শৈল। তোমাকে বলে-ছিলাম যে মাকে খুঁজে পেয়েছি। সে আমার দেশ, কিন্তু তুমি ভাবনা কোরো না। দারোগার সাধ্য নেই নিজের প্রাণ না দিয়ে আমাকে ধরায়।"

শৈল উত্তর দিল, "তাতে কী লাভ? ক'জনকে একলা মারবে তুমি? আর কী হবে মানুষ খুন করে? ভাবলে গা কাঁপে, তুমি পারো লোক মারতে! আমি যা ভেবেছি তাই ভালো।

দারোগা বলেছে সন্ধ্যায় মজলিশ্ করতে আসবে। সেই সময় তুমি পালাবে। আমি বলব বেরিয়ে গেছ, শীঘ্র আসবে। তুমি ছোট ঘরটীতে থাকবে। সে অন্ধকারে আর পাহারা রাখবে না। তখনকার ভার আমার উপর দিয়েছে। আমি তাকে গান বাজনায় ভুলিয়ে রাখব। ততক্ষণে তুমি গ্রামের রাস্তা ধরতে পারবে।"

নরেশ কহিল—"আর তুমি, তোমার উপর যে অত্যাচার হবে তারপরে"—

শৈল উত্তর দিল, "সে ভাবনা তুমি ভেব না। তুমি গেলে কী হবে না হবে তা ভেবে কী করব। তা ছাড়া আমার ষড়যন্ত্রে যে তুমি পালাতে পেরেছ তাই বা কী করে জানবে। শুধু বলো, আমার একটি কথা রাখবে"—

"কী ?"

"অবহেলায় ধরা দেবে না। আর আমার মন বলে এ পথের ফল ভালো হয় না, এ পথ ছাড়বে।"

নরেশ হাসিয়া কহিল—"ছাড়ি যদি কখনও, তবে শৈল তোমার কথা ভেবেই ছাড়ব, আর ধরা, সেধে কি আমরা ধরা দি কখনও ?"

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় এ দুইটি হৃদয় আবার যেন পরস্পরকে ফিরিয়া পাইল।

নরেশ কহিল—"শৈল, কেন মিথ্যে ঠকাচ্ছ আমাকে, তুমি চলো আমার সাথে।"

সেদিন শৈলর চোখে জল ছিল না। আর কাঁদিল না।—

—"না আমি যেতে পারি না, মা, চারু এদের ছাড়তে পারি না। তা ছাড়া একজন সাথে থাকলে তোমারই বিপদ। আর আমার নিজের উপর বিশ্বাস নেই, হয়তো আবার এ পথে ফিরব।"

"না আসতে ইচ্ছে হয় জোর করব না। কিন্তু তোমার নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলেও আমার তোমার উপর বিশ্বাস

আছে। শুধু ভাবছি কেন পাঁচটা বছর আগে তোমাকে পাই নি।"

শৈল কোনো উত্তর দিল না, শুধু বলিল, "যাই আমি খাবার জোগাড় করিগে। আজ আর কোথায়ও বেরিও না।"

বেলা না যাইতেই শৈল সাজ করিতে বসিল। দুপুর বেলাতেই ষ্টীমার হইতে মদ আনাইয়া রাখিয়াছিল। যত গহনা ছিল, একে একে পরিল। তার পর পায়ে আলতা পরিতে পরিতে নরেশকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখাচ্ছে আমাকে।"

নরেশ তেমনি হাসিয়া উত্তর দিল—"মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।"

শৈল বলিল—"মূর্খ লোক, একটু বুঝিয়ে বলো।"

নরেশ কহিল—"সেকালে মুনিরা প্রায় তপস্যা করতে গেলে দেবতাদের ভয় হত, বিশেষতঃ ইন্দ্রের, বুঝি তাদের স্বর্গ মুনিরা কেড়ে নেয়।"

"তারপর"—

"—তারপর আর কী। তারা তোমার মতো একজনকে পাঠাতেন,আর মুনি বলতেন ছাই নীরস এ তপস্যা, সরস রূপের সরসীতে ভাসিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হই। স্বর্গের দেবতারা হাত-তালি দিতেন, আর আনন্দে নাচতেন।"

"—তারপর ?"

"কাজ শেষ হলে যিনি গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে

আসতেন। কেউ কেউ ২।১টি শিশুও রেখে গিয়েছিলেন পৃথিবীতে।"

এ কৌতুক তাহাদের ঘোর বিপদের কথা যেন ভুলাইয়া দিল। শৈল কহিল—"রোসো, হয়নি এখনও, পায়ে ঘুঙুর পরতে হবে, চোখে কাজল দিতে হবে, বুক খোলা ব্লাউস পরতে হবে।"

নরেশ বলিল—"ঘুঙুর কেন।"

"—বা, নাচতে হবে না! পুলিশের তপস্যা কি কম তপস্যা! শুধু দুঃখ এই যে ২।১ জনের তপস্যা ভাঙ্গতে পারলাম না। তপস্যা ভেঙ্গে আর কোথাও যাবার স্থান নেই আমার।"

"আছে"—বলিয়া নরেশ শৈলর কাছে আসিল। বলিল—"শৈল, আমি এখন যাই, ছমাস হোক আটমাস হোক, পরে তোমার যদি মত হয়, তোমাকে নিয়ে যাব। শৈল, একদিনের জন্যও যে আমার জন্য আবার তোমার এ করতে হচ্ছে ভেবে আমার মনে যে কী হচ্ছে, কী করে বোঝাব।"

শৈল দুটি বিষণ্ণ নয়ন নরেশের মুখের দিকে তুলিল। কী সমর্থন ভরা সে-দৃষ্টি। মানুষের অন্তরের যে অংশ কথা কহিতে পারে না, সেই অংশই যেন সে-দৃষ্টি দিয়া বলিতে-ছিল—কেন জিজ্ঞাসা করো। তুমি ডাকিলে মরণের পারে যাইবার জন্য যে ব্যগ্র, তার আবার মত কী।

মুখে শুধু কহিল—"না, এবার সন্ধ্যা হল, ও ঘরটাতে যাও।"

১১

পাশের খাটটি তুলিয়া ফরাস পাতা হইয়াছে। দুইটি রূপার রেকাবে মদের বোতল ও গোলাপজল রহিয়াছে। পাশে হারমোনিয়াম, শৈল দারোগার অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুক্ষণ যাইতেই দারোগা আসিয়া কহিল,"কী গো শৈল।" বলিয়া চাহিতেই এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। শৈলর বাড়িতে আগে সে আসিয়াছে, কিন্তু এ সাজ, এ রূপ সে কখনও দেখে নাই।

তারপর বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"বন্দোবস্ত বেশ করেছিস শৈল। সে কোথায়?"

"পদ্মার ধারে বেড়াতে গেছে, এখখুনি আসবে, ততক্ষণ আমরা আরম্ভ করি।"

"তা কর্।"

"তবে ও ঘর থেকে বেহালাটা নিয়ে আসি।" বলিয়া ছোট ঘরে আসিয়াই নরেশকে মৃদুস্বরে কহিল—"যাও আর দেরি কোরো না, এ পথ দিয়ে আর কখনও যাওয়া আসা কোরো না, কখনও চিঠি লিখো না, এবার যাও।"

নরেশ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল তারপর জোরে শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া কহিল—"জীবনদাত্রী আমার।"—শৈল নিজেকে ছাড়াইয়া তাহার মুখের উপর হাত দিয়া কহিল

"—আর কথা নয়, তুমি যাও, তারপর আমি ফিরব ওঘরে।"

আবার নরেশ তাহার মুখখানি নিজের মুখের দিকে টানিয়া আনিল। সে উদ্যত চুম্বন ফিরাইয়া সে নরেশকে খানিকটা ঠেলিয়া দরজার কাছে লইয়া গেল। পরক্ষণে সন্ধ্যার আঁধারে নরেশকে আর দেখা গেল না।

"—রজনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই দেরি হল"—বলিয়া শৈল ফিরিয়া আসিয়া হারমোনিয়মে সুর দিল,তার পর একটা গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া দারোগাকে দিয়া গান ধরিল—

"সে হোক না কালো আমার ভালো চোখে লেগেছে।
সে যে আমার গিনি সোনা, কষ পাথরে যায় যে চেনা,
সে যে আমার পরশ পাথর, আমায় সোনা করেছে॥"

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিলে হঠাৎ নিজের হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দারোগার নেশা ভাঙ্গিল। "কহিল, তাইতো শৈল, রাত্রি ৯টা বাজে, এখনও লোকটা আসছে না।"

শৈল ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল—"তাই তো গেল কোথায়, ঐ ঘরে তো শোয়, চলুন দেখি ওখানে আছে নাকি।"

বলিয়া দুজনে উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। ঢুকিয়াই শৈল কহিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে। কেমন করে খোঁজ পেয়েছে, সে পালিয়েছে।"

দারোগা গম্ভীর হইয়া কহিল—"কী করে জানলে।"

শৈল কহিল—"এইখানে তার ব্যাগ থাকত সেটা নেই।"

দারোগা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,পরে কহিল—"শৈল, এ কথা কাউকে বলিস না। সে এ অবস্থায় পালিয়ে গেছে এ কথা প্রকাশ হলে আমার চাকরী যাবে। আমি থানার লোকদের বুঝিয়ে দেব, যে আমাদের ভুল হয়েছে। যে এখানে ছিল, সে সে-লোক নয়। এখন সোরগোল করে যদি তাকে না ধরা যায়, শেষ পর্য্যন্ত তাতে আমারই বিপদ। কখনো প্রকাশ করবি না। এ পূজোতে তোকে একটা হার গড়িয়ে দেব।"

শৈল মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"নাই বা দিলেন হার, এইটুকু উপকার আমি করব না! আর প্রকাশ হোলে বিপদ তো আমারও আছে।"

দারোগা কহিল—"তা আছে বৈকি, চল্ এবার গান বাজনা করিগে। মস্ত একটা শিকার ফেঁসে গেল কিন্তু।"

অর্দ্ধরাত্রিতে দারোগা চলিয়া গেল। শৈল আর কাপড় ছাড়িবার অপেক্ষা করিল না। আলো নিভাইয়া বিছানায় আসিল। তারপরে যে বালিশটাতে নরেশ মাথা দিত সেটা বুকে লইয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিল। বাহিরে পৃথিবী তখন স্তব্ধ। শুধু পদ্মার বুকে ঝড় উঠিয়াছিল।

১২

শৈলর জীবনের ধারার কোনো পরিবর্ত্তন হইল না। সংসারের কাজকর্ম্ম করে। সন্ধ্যায় লোক নেয়, তাদের খুসী করে। কিন্তু কেহ জানিত না তাহার রাত্রি কী ভাবে কাটিত। নরেশের একখানি ধুতি ছিল, প্রতিদিন বিছানাতে সেখানা বুকে জড়াইয়া শুইত। পৃথিবীর কোলাহল যখন নিশীথের নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাইত, তখন দূর, অতিদূর হইতে যেন কাহার আহ্বান আসিত—শৈল যাবে আমার সাথে।

শৈল কাঁদিয়া বলিত—আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করলে, একবার জোর করে নিয়ে গেলে না!

কোথায় আজ সে—ভাবিতে গেলেই শৈলর বুক জুড়িয়া হাহাকার জাগিত। একদিন সন্ধ্যার আঁধারে আসিয়াছিল, আর একদিন সন্ধ্যার আঁধারে ইহকালের জন্য তাহার জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আজ হয়তো সে তেমনি নিরাশ্রয়, তেমনি বিপন্ন।

সে বলিয়াছিল—তাহার মায়ের সেবা ছাড়া আর কোনো ব্রত নাই। সে ভীষণ ব্রতে এই দুদিনের দাসীকে মনে পড়িবে কি? তারপরে ভাবিত, যদি মনে পড়িয়া কষ্ট পায়। কেন শেষ অবধি সে নরেশের মনে তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মাইতে

পারিল না। সেই চেষ্টাতেই ছিল, তারপর আবার সব ওলট পালট হইয়া গেল।

কখনও কখনও উঠিয়া যেখানটায় নরেশ তাহাকে বুকে লইয়াছিল, সেইখানটাতে শুইয়া আবার সে চিত্র কল্পনা করিত, সে বিরাট বক্ষ, সে সুদৃঢ় বাহু, সে কোমল মুখ।

আর ফিরিবে না, অথচ এমনি বৎসরের পর বৎসর যাইবে। কত শ্রাবণ ফিরিয়া আসিবে। তারপর,—তারপর শৈল ভাবিতে পারিত না। যতদূর তার কল্পনা যায়, তাহার মধ্যে আর নরেশকে পাইবার আশা করিতে পারিত না।

ভাবিত—কেন বলিল না কয়েকবৎসর পরে একবার ফিরিতে। ষ্টীমারে নরেশ যাইবে, শুধু দূর হইতে একবার দেখিবে। কিন্তু সেদিনও যদি তার বিপদ থাকে, ওদের সেখানকার পুলিশ তো তাকে চেনে।

একদিন স্নানের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় এক বোষ্টমী আসিয়া কহিল—"ভিক্ষা দাও।" শৈল বলিল—"গান করো।"

বোষ্টমী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিল। শৈল কহিল "এ কিসের গান ?" বোষ্টমী কহিল—"মিলনের—"

শৈল কহিল—"বিচ্ছেদ জানো না ?"

বোষ্টমী কহিল, "জানি, শুনবে দিদি ?" বলিয়া আবার ধরিল। কৃষ্ণ তখন মথুরায় গিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণ ভুলিয়াছেন, শুধু ভুলিতে পারে নাই সে যাহাকে দুদিনের জন্য তিনি রাসের রাণী করিয়াছিলেন।

রাধা তখনও যমুনাতে আসেন, শুধু বাঁশি আর বাজে না। আর দেরি করিয়া ফিরিয়া মিথ্যা দিয়া লোক ভুলাইতে হয় না। সংসারের কাজের মধ্যে আর আসে না বিহ্বল-করা মুরলীর আহ্বান, তবু যমুনার জল তেমনি কালো, বনের কুসুম তেমনি মধুর। সখীরা বলে—সে আজ রাজাধিরাজ, বৃথা তার কথা কেন ভাবো। শুধু রাধার মন বলে, মিথ্যারাজ্য। মিথ্যা মথুরা, বৃন্দাবনই চিরসত্য, সে ফিরিবেই।

গান শুনিতে শুনিতে শৈলর চোখ জলে ভরিয়া গেল। কহিল "বোষ্টমী, আর জানো?" "জানি কিন্তু আজ উঠতে হবে, আর একদিন শুনিয়ে যাব,"—বলিয়া ভিক্ষা লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে শৈল কহিল—"দাঁড়াও।" পরে ঘর হইতে একটা টাকা আনিয়া দিয়া কহিল—"অবশ্য এসো আর একদিন।" কিন্তু তাহার মন তো বলে না সে আসিবেই। যে উদ্যত চুম্বন সে ফিরাইয়া দিয়াছিল, তাহার জন্য আজো কি কাহারো হৃদয়ে তাহা জমা হইয়া আছে।

পাশে চারু বসিয়াছিল, বলিল "দিদি কাঁদছ কেন?"

শৈল বলিল—"কাঁদছি কোথায় রে, চোখে কী গিয়েছে আমার। চল্ তোকে স্নান করিয়ে আনি।"

১৩

তার পরদিন নিভাননীকে শৈল কহিল—"মা চারুকে ওর মার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

নিভাননী অবাক হইয়া কহিল—"কেন, আর ওর মা ওকে নেবেই বা কী করে ?"

"সে ভার আমার। আমি ওকে সেখানে নিয়ে যাব।"

নিভাননী কহিল—"রাখলে শেষ পর্য্যন্ত তোরই উপকার, আমি ওর উপার্জ্জন খেতে আসব না।"

"চাই না সে উপকার"—বলিয়া অনেক তর্ক করিবার পর নিভাননীর মত হইল। ঠিক হইল, পর সপ্তাহে শৈল চারুকে পৌঁছাইয়া দিবে।

রেলষ্টেশন হইতে শ্যামনগর ৭ মাইল। চারু বলে "দিদি আর পারি না।" শৈল বলে "আর বেশি দূর নয়।" এমনি করিয়া যখন শ্যামনগর পৌঁছিল, তখন দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে।

শৈল বাড়ি চিনিত। পিছন হইতে ঢুকিয়া কূয়ার কাছে অপেক্ষা করিতেই একটি বিধবা বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন—"তোমার চিঠি পেয়েছি, কিন্তু কী করে রাখব, আকাশ পাতাল ভেবে পাচ্ছি না।"

শৈল কহিল—"বলবেন কুড়িয়ে পেয়েছি। যা হয় করবেন, কিন্তু আর ওকে রাখতে পারব না।" এতক্ষণ চারু জানিত তাহারা বেড়াইতে আসিয়াছে। এবার তাহার মনে সন্দেহ আসিল, বলিল—"দিদি, তুমি কি আমাকে এখানে একলা রেখে যাবে ?"

শৈল তাহাকে কাছে টানিয়া, আদর করিয়া কহিল—

"হ্যাঁ, চারু, আবার কমাস পরে তোকে নিয়ে যাব। এখানে কত মেয়েরা আছে, তাদের সাথে খেলবি।"

"না দিদি আমি তোমায় ছেড়ে কোথায়ও থাকতে পারব না" বলিয়া চারু কাঁদিয়া উঠিল। শৈল বলিল, "আমি থাকলেই ও কাঁদবে, আপনি নিন্, আমি যাই।"

বিধবা চারুকে কাছে লইয়া কহিলেন,"দিদি এখন যাক, আবার সন্ধ্যাবেলায় আসবে।"

চারু কহিল—"আসবে দিদি ?"

শৈল কহিল "আসব। ততক্ষণ লক্ষ্মী হয়ে থেকো।"

বাহিরে আসিয়া চারু ষ্টেশনের রাস্তা ধরিল। সন্ধ্যার পরেই ফিরিবার ট্রেন, কিন্তু এতক্ষণ বোঝে নাই সে কত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মাইল গিয়াই দেখিল রাস্তার পাশে ঘাট বাঁধানো দীঘি, তারই পাড়ে অগণ্য তাল-গাছ, চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ।

শৈল ছায়ায় বসিল। ভাবিল এতক্ষণ চারু তাহাকে না পাইয়া কাঁদিতেছে। আপন মনে বলিল—আজ মনে করবি দিদি বড় নিষ্ঠুর, বড় হোলে বুঝবি কেন দিদি ফেলে গিয়েছিল, সেদিন তোকে ফেলে যেতে দিদির মন কী করেছিল।

সন্ধ্যার সূর্য্য তখন চারিদিক সোনায় ধুইয়া দিয়াছে। শৈলর যেন আর উঠিবার শক্তি ছিল না, হঠাৎ যেন শুনিল— শৈল, যাবে আমার সাথে। চাহিয়া দেখিল কেহ কোথায় নাই, শুধু দূরে একদল গরুর গাড়ি আসিতেছে।

দিনরাত্রি অন্তরে বসিয়া তাহাকে কে ডাকে। একে একে কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। কে জাগাইল তাহার বুকে এ অশান্তি, এ অসম্ভবের কল্পনা। নির্জ্জনে আপনাকে লইয়া ভাবিবারও তাহার অবসর নাই। চোখ বুজিয়া অপরের আলিঙ্গন সহ্য করে, শুধু নিশীথের শূন্য শয্যায় স্মৃতির রাজ্যে তাহার প্রিয়তমকে ফিরিয়া পায়, আবার কল্পনায় অনুভব করে সেই একদিনের সুখ।

তাও তো অপূর্ণ ছিল, সেদিনও তাহাকে সম্পূর্ণ আপনার করে নাই নরেশ। কিন্তু সেই দেহের নিম্নে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া কী সুখ!

কতদিন বাঁচে লোক? সেই সব অনাগত বৎসরের প্রত্যেক দিনটি তাহার এই সহিতে হইবে, ভাবিয়াই যেন ছটফট করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ চোখে পড়িল তাহার দীঘি—এতক্ষণ যেন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই কী অতল কালো জল, যেন মায়ের কোমল বুক। এমন আগুন নাই, যাহা ঐ বুকে জুড়ায় না। শৈল উঠিয়া জলে পা দিয়া শেষ সিঁড়িতে বসিল।

সে স্নিগ্ধ স্পর্শ যেন দিনের দাহ জুড়াইয়া দিল। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে, পশ্চিমাকাশের রঙের খেলা তখনও শেষ হয় নাই।

এ দীঘির বুকে সব শেষ হয়—কিন্তু মরিতে বড় ভয় করে। আবার কোন রাজ্যে গিয়া মানুষ জাগে—সেখানে কি স্মৃতির শেষ হয়।

শৈল জল হইতে পা উঠাইয়া লইল। এখনো ছুমাইল পথ বাকি, ট্রেনের ঘণ্টা খানেকের বেশি দেরি নাই।

শৈল পথ চলিতে আরম্ভ করিল, মনে হইল যেন চারু কাঁদিতেছে। আবার যেন শুনিল দূর দূরান্তরের সেই ডাক। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—দীঘির জল তেমনি কালো, তেমনি স্তব্ধ। একদল পাখী কলরব করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। শৈল ষ্টেশনের রাস্তা ধরিল।

শেষ খেয়া

ব্যথা, ব্যথা, অসহ্য বুকে ব্যথা। নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট। হৃৎপিণ্ডের প্রতি কম্পনে আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা হয়। পাশে দিদি বসিয়া সেবা করিতেছিলেন, একবার ইচ্ছা করিল জল চাই। জানি না কথাটা বলিতে পারিলাম কি না, হঠাৎ যেন তন্দ্রা আসিল, তারপর জাগিয়া দেখি—অদ্ভুত ব্যাপার—লোকে ঘর পুরিয়া গিয়াছে। দিদি কাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছেন। ভগ্নীপতির চোখ ছলছল।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম এটা আমারই দেহ। সেই শয্যা—বুকে তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। যেখানটায় সব চেয়ে বেদনা ছিল, সেইখানে দিদির মাথা। কাঁদিয়া কহিতেছেন, "ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি, তুই যে ছিলি আমার নয়নের মণি।"—দিদির কাছে আসিলাম, কহিলাম,—"এই তো দিদি সর্ব্বরোগমুক্ত আমি, কেন কাঁদো?" বুঝিলাম তিনি শুনিতে পাইলেন না। ক্রমশঃ অবস্থাটা বুঝিতে পারিলাম।—আমি মরিয়াছি।

কিন্তু আপাততঃ দুঃখের চেয়ে কৌতূহলটাই বেশি হইল। এইই মৃত্যু—ইহাকেই লোকে ভয় করে। সবই তো আমার রহিয়াছে। দেখিবার ক্ষমতা, বুঝিবার শুনিবার শক্তি।—বহুকাল আগে শ্রুত একটি গান মনে পড়িল—"কেনরে ঐ

দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।"—শাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর থাকে। বুঝিলাম মিথ্যা নয়, সেই শরীর আমি পাইয়াছি।

আত্মীয় স্বজনেরা মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেলেন।—মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এই দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য কত কী করিয়াছি! দিদি নিজ ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—কতবার তাঁর কাছে গেলাম। কী করিয়া সান্ত্বনা দি—মৃত আত্মাকে অনেকে দেখিতে পায়। এত কাছে ঘুরিতেছি, তিনি কি দেখিতে পারেন না? ধীরে ধীরে মৃতের প্রধান কষ্ট বুঝিতে পারিলাম। আমি একাকী, নিতান্তই একাকী। চিরদিনের জন্য সকলের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

জীবনের শেষ কদিন যেখানে কাটাইয়াছিলাম, কয়েকদিন অবধি তাহার প্রতি মমতায় সেইখানেই রহিলাম। কিছুই করিবার নাই—দিনে এঘর ওঘর করিতাম,—রাত্রিতে সারারাত্রি দিদির শিয়রে থাকিতাম।—আপনার স্নেহাস্পদ কাউকে জাগিয়া পাহারা দিতে বড় সুখ—নিদ্রিতাবস্থায় সকলেই অসহায়, সকলেই শিশু।—কিছু হয়তো করিতে পারিতাম না। কিন্তু তবু বড় ভালো লাগিত। দেহের বালাই নাই—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই। জীবন যেন অনেক হাল্কা হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে হইত বড় নির্জ্জন বড় নিঃসঙ্গ। প্রতিদিন তো সহস্র সহস্র লোকেরা মরে—তাহারা কোথায়—তাহাদের সাথে দেখা হয় না?—

ক্রমে দিদি ও ভগ্নীপতি সকলকে আমার মৃত্যুসংবাদ দিলেন। হঠাৎ একদিন মনে হইল—আজীবন যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছিলাম,যার জন্য এত সহিলাম,মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ মুহূর্ত্ত অবধি যার চিন্তা ছিল আমার ধ্যান, একবার দেখি সে আমার কী করিতেছে।

এই মনে করিবার পরই দেখিলাম আমি তাহারই ঘরে। অনেকটা বিস্মিত হইয়া গেলাম। সূক্ষ্মশরীরের এত দ্রুত গতি! মনে করিলাম দেহই মানুষকে স্থান-কালের অধীন করিয়া রাখে। দেহহীন মন যেখানকার কথা ভাবে, সেই-খানেই উপনীত হয়।

সে তখন দ্বিপ্রহরে ছোটমেয়েটিকে ঘুম পাড়াইয়া তাহারি পাশে শুইয়া মাসিকপত্র পড়িতেছিল।—বাহিরে আবার অবাকজলপান ডাকিয়া গেল। সে ঝিকে দিয়া দুপয়সার আনাইয়া খাইতে খাইতে আবার মাসিকপত্রে মন দিল।

বুঝিলাম আমার মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। সেই পরিচিত ঘরের সাজ সজ্জায় মন যে কী করিয়া উঠিল বুঝাইতে পারি না। মরণের সমস্ত বেদনা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল—আর না, আর কোনোদিন তেমন করিয়া আমার বুকে এ আসিবে না। ঐ তো সেই ঘর যেখানে কয়েকমাস আগে আমারই কোলে বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল—“দেহমন তোমায় দিয়ে পরের ঘর করতে যে কী করে মন, যদি বুঝতে সারাদিন যে কী করে কাটাই, সে এক জানেন অন্তর্য্যামী”—

তাহার মাথার কাছে বসিলাম। বুঝিলাম দেহের সাথে সব বাসনার অবসান হয় নাই। সেই এলোচুলের রাশি লইয়া সেকালের মতো আবার খেলিতে লাগিলাম। চাহিয়া দেখিলাম কী সুন্দর মুখখানি—যেন শৈবালের মাঝে প্রস্ফুটিত কমলটুকু, সেই প্রবুদ্ধ যৌবনশ্রী যেন সে স্বল্পবেশার বসনা-বরণে জলের ধারার অন্তরালে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর মতো। কী সুন্দর যৌবনবন্ধুর বক্ষ, প্রতি নিশ্বাসে উঠিতেছে, নামিতেছে, যেন মহাকাল সাগরবক্ষে চিরচঞ্চল দুটি বাসনার তরঙ্গ—মৃত্যু, তোমার প্রেমের জন্য, সুলেখা, যেন সহস্রবার মরি—সেই নির্ম্মল অতল কালো বিশ্বস্ত আয়ত নয়ন দুটি—কতবার স্পর্শ করিলাম।

এমন সময়ে ঝি ঘরে আসিয়া বলিল, “দিদিমণি তোমার চিঠি, মা দিলেন।”

চাহিয়া দেখি আমার দিদির হাতের লেখা। আমাদের দুইজনকে বিশেষ বন্ধু বলিয়া জানিতেন। হয়তো আমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইয়াছেন। সুলেখা উঠিয়া চিঠি খুলিল—দেখিলাম আমার অনুমান সত্য, আমার সংবাদই বটে।

তারপর টপ্ করিয়া তাহার চোখ হইতে দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কী শান্তি!—কী অস্বস্তি বোধ করিতে-ছিলাম যেন জুড়াইয়া গেল। মন কহিল, মৃতের এই তো শেষ তর্পণ। ছোটবেলায় Elegyতে পড়িয়াছিলাম—

“On some fond breast the parting soul relies,
Some pious drops the closing eye requires;

E'en from the tomb the voice of nature cries,
E'en in our ashes live their wonted fires."

—কথাগুলি কত সত্য তখন বুঝি নাই।

চিরদিনই সে ডায়েরী লিখিত। হঠাৎ তাহার ডায়েরী-খানা কাছে আনিয়া লিখিতে বসিল, "আজ এখনি মিঃ বসুর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, তাঁর নিউমোনিয়ার খবর জানিতাম। কিন্তু এ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে জানিতাম না, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার সাহসও নাই।"

বড় ভালো লাগিল। দিদি কাঁদিয়াছিলেন তাঁহার মায়ের পেটের ভাইএর জন্য, কিন্তু এ কাঁদে শুধু অন্তরের টানে। সংসারের কেউ জানিত না আমাদের সত্য সম্বন্ধ। কত দুঃখে ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে—বুঝিলাম সব সার্থক।

হঠাৎ কে যেন আমাকে নূতন দৃষ্টি দিয়া গেল। আমি এ রমণীর যেন অন্তর দেখিতে পাইলাম। শাড়ীর প্রান্তে চোখ মুছিতে মুছিতে আয়নার কাছে গেল, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম—চোখের জলে কেমন মানায় তাহাকে, তাই দেখিতে—মনটি ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। কিছুক্ষণ পরেই তাহার বন্ধু অলকা আসিল, বলিল, "চল্, ভাই সুলেখা, সিনেমাতে। একলা আমার যেতে ভালো লাগে না, আমার মোটর সাথেই এনেছি সুন্দর ফিল্ম্। তুই তো রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনোকে পছন্দ করিস্, চল্ ভাই দেখতে।"

সুলেখা প্রথম কহিল, "না ভাই, মনটা ভালো নেই।" কিন্তু আমি দেখিতে পারিলাম সে বলিতেছে শুধু তার অন্তরের কাছে আপনাকে নিরপরাধ করিতে। পাছে তার তিরস্কার শুনিতে হয়,—প্রণয়ীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আনন্দোৎসব করা!

অলকা কহিল, "চল্, তোর মন তো দিনরাতই খারাপ হয়ে আছে, চল্ একটু বেড়িয়ে এলে ভালো লাগ্‌বে।"

একটু সাধাসাধির পর আধঘুমন্ত শিশুটিকে মায়ের কাছে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুলেখা বলিল, "আমার যে কাপড় পরতে হবে ভাই।" "তবে তাড়াতাড়ি প'রে নে", বলিয়া অলকা মাসিকপত্রটি দেখিতে বসিল। খানিকক্ষণ পরে সুসজ্জিতা দুই সখী বাহির হইয়া গেল। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রহিলাম।

২

পিতৃহীনাকে বিবাহ করিয়া স্বামী নরেশ সেই সংসারেই থাকিতেন। তাঁহার নিজের আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেহ ছিল না। সন্ধ্যায় তিনি আফিস হইতে ফিরিলেন। খানিক পরে সুলেখাও ফিরিল। পাশের ঘরে তাহার মাতা সুলেখার

কন্যাকে ঘুম পাড়াইতেছিলেন। নরেশ সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বায়স্কোপে গিয়েছিলে বুঝি।"

সুলেখা কহিল "হাঁ, যেতে চাইনি, অলকা জোর করে নিয়ে গেল।"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন যেতে চাওনি, দিনরাত ঘরে বন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে মাঝে মাঝে বেরোন তো ভালো, এত চেষ্টা করি, কিন্তু সন্ধ্যার আগে কিছুতে আস্‌তে পারি না।"

সুলেখা বিষণ্নকণ্ঠে উত্তর দিল "সে জন্য নয়, দুপুরের ডাকে মিঃ বসুর মারা যাবার সংবাদ এসেছে—মনটা ভালো ছিল না।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস—জানি না দুঃখে, কি শান্তিতে ফেলিয়া নরেশ বলিল, "বড় দুঃখের কথা, ভদ্রলোকের হাইকোর্টে বেশ পসারও হচ্ছিল, এত অল্প বয়স, কী ভাগ্যিস্‌ বিবাহ করেন নি।"

জানিতাম কেহ শুনিতে পায় না। তাই বলিলাম,— "আর যাই বলো, ভদ্রলোক বলতে না যদি জানতে আমি কী।"

রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। নরেশ শুইতে আসিবার পূর্ব্বে সুলেখা আবার ডায়েরী খুলিয়া লিখিল, "এমনি সংসার, যারা তাকে আমার শতাংশের একাংশ ভালোবাসে নাই, তারা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পায়, শুধু আমার চোখের জল ফেলিবার ছুটী নাই, এমনি অদৃষ্ট—সমস্ত বুকের মধ্যে যে কী হাহাকার জাগিতেছে তাহা আমি জানি।"

ভদ্রলোক নহি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নতুবা এ দম্পতীর কথা আমার এ সময়ে ছাড়া উচিত ছিল। ডায়েরী সমাপ্ত করিয়া তাহার দীর্ঘচুলের রাশিতে বেণী বাঁধিয়া মুখে কিছু ক্রীম্ মাখিয়া সুলেখা বিছানায় আসিল। খানিক পরে নরেশও আসিল।

সেইদিন মনে হইয়াছিল দূরে, অন্ধকারে, অন্তরালে মানুষ দেখিতে পায় না, তার কত ভাগ্য। না হইলে অর্দ্ধেক লোক পাগল হইয়া যাইত। আমার এই সর্ব্বভেদী দৃষ্টি রুদ্ধ করিবার চোখের পাতা যে হারাইয়াছি। অথচ সে ঘর ছাড়িতেও পারিলাম না।

অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরে নরেশ কহিল, "সুলেখা কাছে এসো।"

সুলেখা নিম্নস্বরে কহিল, "না আজ নয়।"

নরেশ দুহাতে টানিয়া কহিল, "কেন নয়, আজ সারাদিন তোমার কথা মনে পড়েছে, এসো ধন।"

সুলেখা তবু পাশ ফিরিয়া কহিল, "না বড় মাথা ধরেছে।" নরেশ আশঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, "তা আগে বলোনি কেন, একটু টয়লেট ভিনিগার দি—"বলিয়া উঠিয়া আলো জ্বালাইল। তারপর খানিকক্ষণ সুলেখার কপালে হাত বুলাইয়া কহিল, "ভালো কথা, ভুলে গিয়েছি একেবারে, হীরের দুল দুটি আজ দিয়েছে—দেখবে?"

সুলেখা শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, "না আজ থাক্।" নরেশ বলিল, "না,এখানেই আছে", বলিয়া আলমারির চাবি খুলিয়া দুল দুটি

বাহির করিল। উজ্জ্বল আলোতে প্রভাতের শিশির কণার মতো দুল দুটি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নরেশ সুলেখার মাথা কোলের উপর টানিয়া কহিল, "কেমন হয়েছে?" সুলেখা কহিল, "বেশ সুন্দর। কেন অত টাকা খরচ করতে গেলে।" নরেশ তাহার ঠোঁট দুটি টিপিয়া দিয়া কহিল, "তবে কিসের জন্য টাকা আয় করা—একটু ভালো বোধ করছ?" সুলেখা কহিল, "হাঁ, অনেকটা কমে গেছে।" "তবে আলো নিবিয়ে দি, অন্ধকারে আরো ভালো লাগবে এখন," বলিয়া নরেশ আলো নিবাইয়া বিছানায় আসিল। তারপর সুলেখাকে আবার বুকে টানিয়া কহিল, "সুলেখা বড় ভালো লাগছে আজ তোমাকে।" সুলেখা কহিল, "না, আজ নয়",তারপর আপনিই তাহার দুটি কোমল বাহু দিয়া নরেশকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের অতি কাছে সরিয়া আসিল। পবিত্র দাম্পত্যলীলা। ইহা আশ্রয় করিয়া সমাজ সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু আমার মনে সুলেখার যে চিত্র অঙ্কিত ছিল, যাহা ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কোথায়ও ইহার মিল ছিল না। হয়তো তাহার পক্ষে ভালোই। কিন্তু মৃত ব্যক্তিও যে কী পরিমাণে ব্যথা পাইতে পারে তাহা বুঝিলাম।

সে বাড়ির ছাদে গেলাম। রাত্রি তখন গভীর। বহুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনে লা টস্‌কা অভিনয়ে এথেল আর্ভিংকে দেখিয়াছিলাম। তার শেষ দৃশ্যে দুর্গ প্রাচীর হইতে লাফাইয়া আত্মহত্যা করিবার কথা। কী শক্তিমতী সে অভিনেত্রী।

প্রাচীর হইতে যে সব কথা আছে, সর্ব্বস্বহারা সে রমণীর সে আর্ত্তনাদ বহুদিন মনে পড়িয়াছিল। অন্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে অনুভব না করিলে মানুষ সে রকম অভিনয় করিতে পারে না। কিন্তু সব অভিনয়, উদ্দীপনার পশ্চাতে তাহার মনে এ জ্ঞান ছিল, যে প্রাচীর হইতে পড়িলে নিম্নে নিরাপদ অবস্থায় তাহাকে ধরিবার বন্দোবস্ত আছে।

আজ মনে হইল গভীর অভিনয়ে আত্মবিস্মৃতা আত্ম-প্রবঞ্চিতা এ নারী ভালোবাসার রাজ্যের সীমাও কখনও স্পর্শ করে নাই। জানিত স্বামীপুত্র ছাড়িতে আমি কখনও বলিব না। তাই বলিত, 'দূরে, অতিদূরে আমাকে কোথাও নিয়ে চলো, যেখানে মনের মতো করে তোমাকে পাই।" জানিত বুভুক্ষু দেহের যন্ত্রণা কোনোদিন তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না। তাই বলিত, "তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত এ দেহ অপরকে দিতে হয়। এ গ্লানি আমাকে দিন দিন ক্ষয় করছে।" হায়রে, যাহা দেখিলাম সে কি গ্লানির চিহ্ন, না ক্ষয়ের পরিচয়।

তবে দ্বিপ্রহরের চোখের জল! কেমন করিয়া বলিব সে কী। একটি নারীকেই প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি, নারীচরিত্র অধ্যয়ন করি নাই। কিন্তু সে যেন বড় সৌখীন দুঃখ। মিষ্ট বস্তুতে যতটুকু অম্ল দিলে মধুর হয়, ততটুকু শুধু, তাহারই জন্য আমাকে ইহার দরকার ছিল। শুধু তাহারই জন্য অচঞ্চল বুকে এ আমার প্রতিদিনের অরুন্তুদ যন্ত্রণা দেখিয়াছে। তাহারই জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল,

তাহারই জন্য যেদিন এ খেলায় তার আর রস ছিল না, এ পথের বিপদ যেদিন তার শ্রান্তি আনিয়াছিল, সেদিনও সে খেলা শেষ করে নাই, সে পথ ত্যাগ করে নাই। হয়তো এত ভালোবাসার উপর একটু মমতাও বা হইয়াছিল। তবুও মনে হইল যে এ সাধারণ ভ্রষ্টা নারী নয়। ইহার মনের কাছে ইহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তাই স্বামীর কাছে এই অনিচ্ছা—তাই সখীর অনুরোধ এই প্রথম উপেক্ষা। সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়া সে ভালোবাসে নাই। তাই শক্তি পায় নাই। পদে পদে নিহত আদর্শকে বাঁচাইবার জন্য এ ডায়েরী। হায় অভাগিনী, তোমার মনের কতটুকু সত্য, কতটুকু অপ্রকৃত তুমি নিজেও জানো না।

এই সেই ছাদ—পুরাতন কত চিঠির কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। একবার লিখিয়াছিল, "কী সুন্দর চাঁদের আলো উঠেছে—ছাতে বেড়াচ্ছিলাম। এমনি সন্ধ্যায় আর এক জন বলেছিল,—ইচ্ছা করে, তোমায় ভেঙ্গে চুরমার করি, আরো কত কী? শুনব কি সে সব কথা আর কোনোদিন, কবে?—বন্দিনী তোর প্রাচীর কবে ভাঙ্‌বে? মন শুধু এই কথা বলে।"

এই ছাতে—অথবা সে এমনি একদিন সিনেমা দেখিয়া আসিয়া নিজের ঘরে বসিয়া অন্যের মন কাড়িবার জন্য কথা—মন যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মন বলিয়া উঠিল—তুমিই বা কি এমন উঁচু; সারাক্ষণ আমি-আমি করিয়াই পাগল। তোমার দুঃখটাই বড় আর

তাই বোঝাই কি একমাত্র ভালোবাসার পরিচয়।—সন্তানবতী স্বামীসহচরী ইহার জীবনের সকল কথা হয়তো বোঝে নাই।

ঠিক হয়তো বুঝি নাই। কিন্তু আর নয়। বলিলাম "জানি না এ রাজ্যের কে অধীশ্বর—সংসার হইতে আমাকে সরাইয়া লও, আর দেখিবার ইচ্ছা নাই।"

বলিবামাত্রই কোথায় গেল কলিকাতার সহস্র আলো। প্রলয়ের বাতাসও যেন এত জোরে ছোটে না। এমনি একটা কিসে আমাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। ঊর্দ্ধে, মহাকাশে, এক গতির ভিন্ন আর কিছুর সংজ্ঞা রহিল না।

৩

খানিকক্ষণ পরে যেন মনে হইল সাথে আর কেউ আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে বাপু তুমি, যে জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছ, নিশ্চয় আর জন্মে ব্রুকল্যাণ্ডে রেস দিতে।"

পাশ হইতে কে উত্তর দিল, "এত জোরে যাচ্ছি বলে দেখতে পারছ না। আমার কাজই এই।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী কাজ?"

"মৃত্যুর পর সব আসক্তি ফুরিয়ে এলে আত্মাদের নিয়ে আসা।"

"কোথায়?"

"একটু পরেই দেখ্‌তে পাবে।"

"তুমি কে, বাঙ্গালী ?"

"না, আমার দেশ ছিল ব্রেজিলে। মৃত্যুর পর সব আত্মাদেরই এক ভাষা। জীবিত থাকলে বুঝতে যে তুমি যা বল্‌ছ তা বাংলা নয়।"

আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, কহিলাম, "রোজই তো কত লোক মরছে, তাদের সকলকেই তুমি আনো ?"

সে উত্তর দিল, "না, আমার মতো যারা এ পারে, তাদের মধ্যে অনেকেরই এই কাজ; আরো অনেকের অনেকরকম কাজ আছে।"

আমি আরো বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "এখানে কি পারাপার আছে না কি ?—কে তোমাদের দেয় এ কাজ ?"

"এখানকার সব কথা আমি বুঝি না, যাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি, সে ভালো বোঝাতে পারবে। আমার এই কাজ শুধু এই জানি। আর জানি যতদিন না আমার সঞ্চিত অথচ অভুক্ত ধনের মায়া না কাটাতে পারব, ততদিন এ পারে থাকতে হবে।—আর বেশি দূর নেই।"

বুঝিলাম লোকটি আর বেশি কথা কহিতে চাহে না, তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে নক্ষত্রটি জ্বলজ্বল করছে, ওটা কী? পৃথিবীও অনেকক্ষণ ছেড়েছি, তখন তো দুপুর রাত্রি ছিল। কিন্তু রাত্রি যে আর পোহায় না।"

সে উত্তর দিল, "ঐ দূরের নক্ষত্র পৃথিবী। সে সৌরজগৎ

ছেড়ে কত সৌরজগৎ পার হয়ে এলাম, এখানে কি দিনরাত্রি আছে? প্রথম প্রথম তো ভুল আমারো হত।"

সাথী পাইয়া মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কৌতূহলে অস্থির হইয়া উঠিলাম। অথচ ভাবিলাম,—এ বেচারী বড় খাটে, ইহাকে আর বিরক্ত করা ঠিক নয়। একবার মনে পড়িল—যদি পুরাণের বর্ণনা ঠিক হয়। যদি সত্য সত্য সেই ভয়ঙ্কর নরক থাকে। দেহের সঙ্গে অনুভূতি তো যায় নাই। আর যাহা করিয়াছি, তাহা শাস্ত্রে, পুরাণে, সকলেই তো পাপ বলিয়াছে, আর শাস্ত্রের কথাই তো অনেক পরিমাণে খাটিয়া গিয়াছে।

একটু আশঙ্কিত হইলাম। কিন্তু আপন মনে কে যেন শক্তি আনিয়া দিল—কে যেন বলিয়া দিল, যদি সে পাপ হয়, তবে তার প্রায়শ্চিত্ত প্রতিদিনের যন্ত্রণায় সাথে সাথে হইয়া গিয়াছে। আর নরক, সে ছোট পাপের জন্য। যে সমস্ত প্রাণ দিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া বড় পাপ করিতে পারে, তার জন্য নরক সৃষ্ট হয় নাই। সে আপন শক্তিতে নরকে কুসুম ফুটায়। বারে বারে যেন মন বলিতে লাগিল—Even sin is a test of man. শেষ বিচার শুধু সেই test লইয়া, বাকি সব মানুষের সৃষ্টি।

গতি কমিল না। দূরে নক্ষত্ররাজি তেমনি জ্বলিতে লাগিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম কোনো গ্রহের জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিয়াছে, কোনো গ্রহ নিবিয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র ধূমকেতু কোন অদৃশ্য কামানের গোলার মতো

ছুটিয়া যাইতে লাগিল অনতিদূরে নিবিড় নীহারিকাপুঞ্জে নূতন জগৎ সৃষ্টি হইতেছে কিন্তু দৃশ্যে রুচি ছিল না। যে ভাবনা মনে জাগিতেছিল সে এই—এ যাত্রার শেষ কোথায়, আর এ পথের শেষে আছে কী ?

হঠাৎ সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "এইবার এসেছি।" বলিয়া যাহার কাছে লইয়া গেল তাহাকে মানুষের ভাষায় মেঘ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাহারই উপর আমারি মতো আর একজন। এবার গতিহীনতায় আমার সঙ্গীকেও দেখিতে পাইলাম।

মেঘের উপর যে বসিয়াছিল সে বলিল, "এসো আজ রাত্রি এখানে তোমাকে কাটাতে হবে, আমার সাথে।"

আমি কহিলাম, "সে কি ! আমার ধারণা ছিল যে এখানে দিন রাত্রি নেই।"

সে উত্তর দিল, "সে কথা সত্যি, কিন্তু পৃথিবী থেকে নূতন যারা আসে তাদের বোঝাবার জন্য আমরা পৃথিবীর ভাষা ব্যবহার করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে ব্যবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু কাল সকালে আমায় করতে হবে কী ?"

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম আগের সঙ্গী নাই। বোধ হয় আর কোনো নিরাসক্ত আত্মাকে আনিতে ছুটিয়া গিয়াছে। নূতন সঙ্গী বলিল, "সে সব কথা পরে হবে। সঙ্গীর কথা ভাবছ বুঝি, সে তার নিজের কাজে গেছে।"

আমি কহিলাম,—"ভাগ্যিস্ এ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন্ নেই, এ যে অবিরত পরিশ্রম।"

সে উত্তর দিল, "এইই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। তোমায় যেন এ পরিশ্রম না করতে হয়। পরে বুঝ্বে সব।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়,—আমি কহিলাম, "সত্যি সত্যি আর হেঁয়ালি বাড়িয়ে মৃত্যুর পর আমায় পাগল কোরো না। বহুকষ্টে জীবিত থাকতে পাগল হইনি—তুমি কি বাঙ্গালী?"

"হাঁ বাঙ্গালী, আমার নাম ছিল অপূর্ব্ব মিত্র, সবি বুঝতে পারবে। সারা জীবন অধীর হয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছ। এবার ধৈর্য্য শেখো।"

অপূর্ব্ব মিত্র! নামটা যেন চেনা চেনা মনে হয়। বলিলাম, "চেন তুমি আমায়?"

"তোমায় চিনি না? অনেক কথা তোমার সাথে আছে—তাই তোমার শেষ খেয়া কাল সকালে ঠিক করেছি।"

"তুমিই বুঝি কর্ণধার?"

"হাঁ, আমিই কর্ণধার।"

সূর্য্যচন্দ্রতারকাহীন সেই অসীম শূন্যে আমার এই নূতন বন্ধুটির সহিত যত সময় কাটাইয়াছিলাম, পৃথিবীর মাপে তাহা কতক্ষণ স্মরণ নাই। মনে পড়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এখানকার কাজ কে ঠিক করে, শেষ খেয়াই বা কী? কেনই বা অনেক আত্মা এপারেই রয়েছে?"

বন্ধু উত্তর দিয়াছিল, "মৃত্যুর পর কিছুদিন মন সংসারেই পড়ে থাকে, ততদিন তাদের কোনো খোঁজের দরকার হয় না। তারপর ওজন শিথিল হয়ে এলেই আমরা এখানে নিয়ে আসি। যারা সকল বাঁধন ছিঁড়ে সকল স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে পারে, তারাই শেষ খেয়া পার হয়। শেষ পর্য্যন্ত যাদের মনে কোনো কামনা থেকে যায়, তারা এপারেই থাকে। এখানকার কাজ কেউ বলে দেয় না। যারা ওপারে যাবার অনুপযুক্ত, তারা আপনাদের কাজ আপনারাই ঠিক পায়। কেউ কেউ তাদের মধ্যে কিছুদিন পরে সব ভুলতে পেরে খেয়া পার হয়। যে নদীতে খেয়া, তাকে সেইজন্য বলে—স্মৃতি-বৈতরণী। কিন্তু এই খেয়া পার হওয়া নিয়ে একটা বিশেষত্ব আছে, এইদিন মৃতের আত্মা তার জীবনকালের দেহ ফিরে লাভ করে—আর জীবনের সমস্ত গোপন সাধ এই দিন বলে যেতে হয়, নতুবা খেয়া নড়ে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর, ওপারে কী ?"

বন্ধু বলিল, "তা জানি না। যদি মনে করে থাকো, যে মরণের দ্বার পার হলেই সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে তবে অতি ভুল করেছ। এ রহস্যের সন্ধান যারা পায়, তারা হয়তো বেঁচে থাকতেই পায়। নতুবা মরণের পর একটা নূতন দেশের খবর মেলে মাত্র। বিলেত গিয়ে নূতন দেশ দেখেছিলে সাগরপাড়ি দিয়ে। এও আর একটা নূতন দেশ দেখছ মরণের পারে এসে। রহস্য যা রহস্যই থেকে যায়—যারা ওপারে যায়, তারা আর ফেরে না।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার এত কথা কী করেই বা জানলে, আর আমাকে চিন্‌লেই বা কী করে?"

"সেই কথাই তোমায় আজ বলব," বলিয়া বন্ধু আবার আরম্ভ করিল। তাহার কথার মধ্যে এমনি একটি শান্ত ভাব ছিল যেন মনে হইল তাহার সকল কামনা শেষ হইয়া গিয়াছে, অসীম রহস্যের সন্ধান যেন মিলিয়াছে; তাই ভাবিতে লাগিলাম—এ কেন এ পারে।

বন্ধু বলিল, "তোমার মতো আমিও স্থলেখাকে ভালো বাসতাম—তোমার মতো আমিও তার জন্যে অকালে জীবনের রাজ্য ছেড়েছিলাম—কিন্তু ছেড়ে বুঝেছি সব মিথ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ভালোবাসতে স্থলেখাকে —কতকাল আগে, কী হয়েছিল, কী করেছিল সে?"

বন্ধু উত্তর করিল, "তখন তোমার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। রবীন্দ্র ঠাকুরের একটি নাটকের অভিনয় করেছিলাম আমরা অনেকে মিলে—আমাদের উভয়ের অনেক গান একত্র শিখতে হয়েছিল। তখন স্থলেখার সবে বিবাহ হয়েছিল। জানি না কী মায়া ছিল তার চোখে—মনে হত যেন একটু সত্যিকার স্নেহের আশায় এই নারীর মাঝে এক অতি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী আছে। কী ব্যথায় ভরা ছিল তার দৃষ্টি। কিন্তু আমরণ আমি তাকে কখনো একথা বলিনি।"

আমি বলিলাম, "বলো কী একেবারে প্লেটোনিক?" বন্ধু উত্তর দিল—"যে রাজ্যে এসেছ, সেখানে platonic আর

non-platonicএ কোনো প্রভেদ নেই। আমার চোখ বলেছিল, তার চোখ তা শুনেছিল, এইই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে এসে এই বুঝেছি যে, যে-স্ত্রীলোকের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করলে জীবনের অপমান করা হয় না, তার দেখা সহজে মেলে না, কখনও মিলেছে কিনা সন্দেহ।"

আমি বলিলাম—"কী করে এ জ্ঞান তোমার হল?"

বন্ধু কহিল—"কী করে? তোমাকে বলেছি বোধ হয় খেয়াপার হবার সময় সকলেরই সকল গোপন সাধ বলে যেতে হয়। এই সব গোপন সন্ধান জানিয়ে দেয় পৃথিবীর ভালোমন্দে আর এখানকার ভালোমন্দে কত প্রভেদ। কালই দুজন নারী পার হবে, দুজনেই বাঙ্গালী, নিজেই দেখতে পাবে।"

কিছুক্ষণ আগে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম—"কিন্তু সুলেখা তো আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত—নারীর যা শ্রেষ্ঠদান, তা তো তার হাত থেকে আমি পেয়েছি।"

বন্ধু আবার উত্তর দিল—"সব কথা তোমায় বলি,হয়তো সে দান সত্য, হয়তো সত্য নয়। কিন্তু ঠিক জেনো শেষ পর্য্যন্ত যার বিকাশ নেই সে বস্তু নিতান্ত অসার, ততশক্তি সুলেখার কেন, পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নেই।

স্থায়ী সুখ যে চায়, সে অনেক সময়ে জানে না যে সে সুখী, কারণ সে সুখ বড় শুষ্ক। পৃথিবীতে যে সমস্ত নরনারী দিনের উপর দিন গৃহকর্ম্ম ক'রে সন্তান পালন সামাজিক

কর্ত্তব্য ক'রে দিন কাটায়—যারা জীবনে একদিন ফোটা ফুলের দিকে তাকায়নি—তাদের সুখ স্থায়ী কিন্তু এ সুখে সকলের মন তৃপ্ত হয় না। একদল জীব নিজেদের মৃত্যু স্থির জেনে আর একদলকে সেই পরিণামের পথে জন্ম দিয়ে যায়—এতে সৃষ্টি স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু মধুর হয় না।

"যা মাধুর্য্য আনে,তা রূপ। কিন্তু শ্রেষ্ঠরূপের সঙ্গে বিপদের, কঠোরতার, তপস্যার চিরদিনের সম্পর্ক। সব চেয়ে উজ্জ্বল কী—বিদ্যুৎ, ঝড়ের মেঘে ছাড়া তা খেলে না। সব চেয়ে আনন্দ কিসে—ব্রহ্মদর্শনে,তপস্যা ছাড়া তা মেলে না। সব চেয়ে পৌরুষ কিসে—ন্যায়যুদ্ধে, মুক্ত রক্তধারায় ছাড়া তা ব্যক্ত হয় না। সব চেয়ে কমনীয় কার মুখ—সদ্য প্রসবমুক্তা নারীর, প্রসববেদনার আস্বাদ ছাড়া সে কান্তি ফোটে না। শেষ পর্য্যন্ত এত সইবার শক্তি নারীর নেই।

"কিন্তু সব সময়ে সেটা তার নিজের দোষ নয়। সমাজ সংসার তার উপর যে বোঝা চাপিয়েছে—তাই বইতে বইতে তার আর শক্তি থাকে না। তাছাড়া সে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল।"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম—"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তারা মায়ের জাতি।"

"কিছুই আমি ভুলিনি," বলিয়া বন্ধু আবার কহিল—"নারীর মাতৃত্বের কথা আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। সেও তার এক বোঝা—অনেকের শক্তি শুধু তাইতেই ক্ষয় হয়ে যায়। পুরুষের তাতে লাভ,নারীর তাতে সান্ত্বনা; তাইতে ও জিনিসটা সম্বন্ধে এত কাহিনী গড়ে উঠেছে। আর কী জানো, পরিণত

জীবনে ছেলে মায়ের কথা, আর মেয়ে বাপের কথাই বেশি মধুরভাবে ভাবে। এ স্বাভাবিক, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষকেই লোকে দেখে, তার কথাই শোনে—তাই মনে করে যে অনেকের উন্নতির মূলে তাদের মা।”

আমি আবার বাধা দিয়া কহিলাম—“তবে কি তুমি বল্‌তে চাও সন্তানের জীবনের উপর মায়ের প্রভাব নেই?”

বন্ধু তেমনি শান্তভাবে উত্তর দিল—“আমার যা বলবার শেষ করতে দাও—আর সময় বেশি নেই। প্রভাব থাকবে না কেন—একটা বয়স অবধি প্রলোভনের পথ হতে সরিয়ে রাখা, সদভ্যাস শেখানো এ সবে খুবই প্রভাব আছে—কিন্তু আজকালকার জগতে যখন মানুষের কৌতূহল কর্ম্ম, রীতি, নীতির সকলের মূলে পৌঁছেছে, যখন কী সত্য কী মিথ্যা কী পাপ কী পুণ্য, এ সব বিচার মানুষ তার নিজের বুদ্ধিমত্তা আর নিজের সাহস দিয়ে করতে চাইছে, যেখানে সব প্রাচীর ভাঙ্গছে, সব মন্ত্র নূতন করে লেখা হচ্ছে—সেখানে শৈশবের শিক্ষার ফল, যে যাই বলুক না কেন, বড় কম। এ দিনে যা মানুষকে বাঁচায় বা মারে—সে হচ্ছে মাতৃক্রোড় ছাড়্বার পরে মানুষ যা শিখ্‌তে পায়, এবং যে ধাতুতে দিয়ে তার শরীর নির্ম্মিত, তাই—কোনটাই কারো হাতে নেই। পিতা-মাতা সন্তানকে শুধু বয়ে আনে germ-plasm রূপে—তাকে সৃষ্টি করে না। বলছিলাম, নারী দুর্ব্বল, তার শারীরিক শক্তি কম। তাছাড়া এই মাতৃত্বের ফলে সে অর্দ্ধজীবন রুগ্ন। যে শক্তি সৃষ্টির ভার নরনারীর মধ্যে এই ভাবে ভাগ করেছে, তার

সঙ্গে তর্ক করবার সুযোগ মানুষের হয় না। তবে এটা সত্যি যে সে কাজে পুরুষের অংশ অতি সামান্য—একটা নির্জীব পিণ্ডকে জাগিয়ে দেওয়া মাত্র। জীবনের নিম্নস্তরে অনেক জাতিতে এই কাজ শেষ হলে পুরুষের জীবনেরই কোনো আবশ্যকতা থাকে না।

"কিন্তু মানুষের তা নয়। তার অনন্ত অবসর। তার মরবার শক্তি, বাঁচবার শক্তি অদ্ভুত। তাই সে সহস্রবার প্রকৃতিকে জয় ক'রে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছে—তাই প্রতিদিন চির-অপরাজিত প্রকৃতির আহ্বান সে এখনও শোনে। তাই চির-অতৃপ্ত তার রূপের পিপাসা। সেই দেখেছিল সৃষ্টিতে প্রথম স্বপ্ন—সেই এঁকেছিল প্রথম ছবি, সেই গেয়েছিল প্রথম গান।

"প্রথম যৌবনে এ পিপাসা নারীরও থাকে। যে-শক্তির ক্রীড়নক সে, সেই শক্তিই সেদিন তাকে সেই প্রথম গান শুনবার কান দেয়। কিন্তু তার রূপ, তার যৌবন ক্ষণস্থায়ী। নারীর রূপ—নিজের চোখে দেখোনি—যেটুকু প্রণয়ীর দান, তাই নিত্য, বাকিটুকু আতসবাজির মতো একটা বয়স পর্য্যন্ত সঞ্চিত থাকে, তারপরে এক বসন্তরাত্রিতে অনললীলায় সব শেষ করে ভস্মে রেখে যায় স্মৃতি। তাই যৌবনে নরনারীর মিলন শুধু দেহের মিলন নয়, প্রাণের মিলনও। পর-জীবনের মিলন শুধু বন্ধনের, কর্ত্তব্যের মিলন, অধিকাংশ পরিবার এই আশ্রয় করে স্থায়ী হয়ে আছে।

"সেদিন অতৃপ্ত পুরুষ,শ্রান্ত নারী—এ দুপ্রাণের মিল আর

হয় না। তখন নারী ব্যবহার করে তার শেষ অস্ত্র—ছলনা। এ ছলনা তার রক্তের প্রতি ধারায় আছে—এরই বলে সে আদিমযুগে পুরুষের অত্যাচার হতে আপনার অস্তিত্ব বাঁচিয়েছে। দুর্ব্বল পশুর বর্ম্ম তার বর্ণ, নারীর বর্ম্ম এই কপটতা। তাই পুরুষকে তৃপ্তি দিতেই হোক্, আর প্রথম-জীবনের কর্ম্মফল বাঁচাতেই হোক্ সেদিন সে যে-কথা বলে, তার মধ্যে তার প্রাণ থাকে না, শুক্তির সন্ধানে অতলে ডুববার শক্তি তার থাকে না, সে খোঁজে নিরাপদ স্থান, শান্তি। বাকিটুকু তার অভিনয়। প্রথম যৌবনে সব নারী অভিসারিকা। যৌবনাবসানে সকলেই অভিনায়িকা। সেই অভিনয়ের কিছু দেখেই তোমার সংসারাসক্তি গেছে—কেমন, নয় ?”

আমি কহিলাম—“কী করে তুমি এত জানো, তুমি কি আমার সাথে সাথে ঘুরতে ?”

সে উত্তর দিল—“অনেকদিন, অনেকদিন ঘুরেছি। যে বিষে আমি মরেছি সেই বিষ থেকে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি,শেষ পর্য্যন্ত পারিনি। শোনোনি কি তুমি,তোমার কানে কানে কতবার বলেছি—মূর্খ ?”

আমি বলিলাম—“শুনেছি বই কি। কিন্তু আমি ভাবতাম আমার অন্তরে ছুটি ভাগ আছে—একটি পাগল, একটি সুস্থ। আমি ভাবতাম এই সুস্থ অন্তরই আমাকে ওকথা শোনাত।”

বন্ধু বলিল—“ভুল, তোমার সকল অন্তরই পাগল ছিল। এমন করে ভালোবাসতে আছে ? আমিই তোমার সাথে সাথে

ঘুরেছি, সাবধান করেছি, কিন্তু ফল যখন হয়নি, তখন আর তা বলে লাভ কী—এবার চলো।”

৪

এবার অতি ধীরে ধীরে চলিলাম। যাইবার পথে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি যা বললে সব পুরুষের কথা। কিন্তু নারীর পক্ষের কথা তো আমরা জানি না। দুজন নারী নিঃসঙ্কোচে পুরুষের কথা বলতে পারলে কী বল্‌ত কে জানে।”

বন্ধু বলিল—“সে কথা ঠিক, সে অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয় শুধু প্রেম। সংসার ছেড়ে আসার সঙ্গে সে প্রেম শীতল হয়ে গেছে—তাই হয়তো সে পক্ষের কথাও আমরা বুঝি না, বুঝতেও চাই না। তবে তোমার সকল খবর রাখি, তোমার সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে পারি।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কী?”

বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিল—“সুলেখা তোমাকে সব দিয়েছিল—কিন্তু বিনিময়ে যা চেয়েছিল, তা সব পায়নি। আবেগে, অভাবে অধীর হয়েছ, তাই তার অবস্থায় নিজেকে কল্পনা না করে বিচার না করে অনেকদিন তার উপর অবিচার করেছ। তারপর জানো—অমন অবস্থায় নারী যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে তার প্রথম ভয় হয়—এবার বুঝি সে সকল শ্রদ্ধা হারালো, তুমি বুঝি মনে মনে তাকে হেয় মনে করছ।

"তুমি প্রতিবাদ কোরো না—আমি জানি সেটা তার ভুল। এ প্রেম যে অপবিত্র মনে করত, সে এর জন্য এত সইত না। তুমি তার চপলতার প্রতিবাদ করেছ—কিন্তু সে প্রতিবাদের ভঙ্গী তার মর্ম্মস্থানটিকেই আঘাত করেছে।

"যে ভালোবাসা সুলেখা কেন, অধিকাংশ নারী চায়—সেটা দেহের তত নয়, যদিও তার আকর্ষণ অতি তীব্র—সে হচ্ছে—কিছু প্রতিদানের আশা না রেখে কেউ একটু মধুর ভাবে ভাববে—কারো জীবনে সে দেবী হবে, কেউ তাকে সংসারের সহস্র মলিনতা থেকে উঠিয়ে আপন জীবনে পূজা করবে।

"সে পূজা তুমি করেছ জানি। তোমার বুকের রক্তে সে বেদীতল ধুয়ে গেছে তাও জানি, কিন্তু মনের বিষই তুমি তাকে অধিক দিয়েছ—সে পূজার খবর সে পায়নি অনেক সময়।

"তার পর কথা—তুমি তার আর একটি মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝেও বোঝোনি। সে হচ্ছে তার ভয়। যত বয়স বেড়ে যায়, সব হারাবার সাহস তত কমে আসে। শুধু থাকে ভীতি। সে যে কী রকম ভয়, একমাত্র নারীই হয়তো তা বুঝতে পারে। সেদিন যা দেখে এসেছ তা শুধু আত্ম-প্রবঞ্চিতার অভিনয় নয়। ভালো না বেসে কেউ এতদূর আসতে পারত না, অন্ততঃ সুলেখার মতো মেয়ে নয়। শুধু তার অন্তর কেঁপে কেঁপে বলেছে—যদি ভবিষ্যতে নরেশ বুঝতে পারে কোনোদিন, শোনে কোনো কথা—যদি সে জোর ক'রে

তার আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করত, তবে সেই স্মৃতিই যে তখন হবে তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী,—সুলেখার প্রতিবাদেরও অবকাশ থাকবে না। শুনলে হয়তো কষ্ট পাবে—কিন্তু ইদানীং যদি তোমাকে কষ্ট না দিয়ে, সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যদি সে ফিরে যেতে পারত তবে হয়তো সুলেখা মুক্তি পেত।”

আমি কহিলাম—“তোমার অনেক কথাই সত্যি—কিন্তু এতই যদি বুঝেছ তবুও কেন এ পারে আছ।”

বন্ধু বলিল—“শুধু সেই কথাটিই আমি বলিনি—আমার স্ত্রী বেঁচে আছে। বেঁচে থাকতে কখনও তাকে স্ত্রীর অধিকার দি’নি, কিন্তু আজ তাকে ভুলতে পারি না।”

আমি বলিলাম “বলো কী! একেবার পুরুষ-সাবিত্রী, একটু Quixotic নয় কি?”

সে বলিল—“একটু কেন, বেঁচে থাকতে সময়ে সময়ে যথেষ্ট Comic আমার মনে হত, কিন্তু আজ ভাবি সে কষ্ট বৃথায় যায় নি। সাবিত্রীর জীবন যদি আদর্শ হয়, তবে সে পুরুষের পক্ষেও আদর্শ। সেজন্য আক্ষেপ করি না। সে বড় একাকিনী, শুধু তাকে নিয়ে যাবার আশায় এ পারে আছি—এই তো বৈতরণী।”

মুহূর্ত্তের মধ্যে কী পরিবর্ত্তন—এ যেন আমাদের দেশেরই নদী। আমিও দেহী, বন্ধুও দেহ পাইয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম—“তোমাকে যেন কলেজে দেখেছি।” সে বলিল “হাঁ, আমি তোমার কিছু উপরে পড়তাম।”

এই বৈতরণী—কী স্নিগ্ধ বাতাস, কী নির্ম্মল জল, ফোটা ফুলে কূলভরা ; বহুদিন পরে জীবনের আস্বাদ পাইয়া যেন ভুলিয়া গেলাম মরিয়াছি।

বন্ধুকে কহিলাম "এ শূন্যে কোথা থেকে এল, জল, বাতাস, ফুল ?"

বন্ধু উত্তর দিল "প্রথমদিন দেখে আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছলাম। পরে বুঝেছি, যে চোখের জল কখনও চোখ দিয়ে পড়ে না, সে এসে এই নদীর বুকে সঞ্চিত হয় ; যে দীর্ঘনিশ্বাস মানুষে শোনে না, আজ পাচ্ছ তারই স্পর্শ ; আর যে জীবন ফোটবার আগেই মায়ের কোলে ঝরে যায়, সেই শিশুরাই এসে এই নদীর কূলে ফুল হয়ে ফুটে থাকে—তাদের স্বর্গ-নরক মুক্তি-বন্ধন নেই।"

দুটি স্ত্রীলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এরা কারা।"

বন্ধু বলিল—"ওদেরই কথা কাল রাত্রিতে বলেছিলাম। ওদের মধ্যে একজন থিয়েটারের নর্ত্তকী, আর একজন কলকাতার একটি কূলনারী—ওরাই আগে পার হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নর্ত্তকীটি কালই মরিয়াছে, কূলনারীটি মৃত্যুর ছমাস পরে আজ পারের চেষ্টা করিতেছে। কাল উভয়েই আমাদের কাছেই ছিল। আমাদের একটু আগেই খেয়াঘাটে পৌঁছিয়াছে।

আমি বলিলাম—"নর্ত্তকীটি কাল মরেই এল, আর অন্যজনের এত দেরি হল যে।"

বন্ধু বলিল—"সে তো সহজ কথা, নাচওয়ালীর তো

সংসারে আপনার কেউ ছিল না, কোনো বন্ধনই নেই। ওর পার হতে কষ্ট কী ?”

প্রথমে নর্ত্তকীটি উঠিল। আমি ও অন্য রমণী কূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দ্রুতবেগে খেয়া চলিল—পরপার অস্পষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেয়া ফিরিয়া আসিল। মহিলাটি উঠিলেন—কিন্তু খেয়া আর নড়ে না। বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“বৈতরণীর কূলে সমস্ত গোপন ইচ্ছা বলেছেন ?” নারীটি উত্তর দিলেন—“হাঁ।” বন্ধু বলিল “তা হতে পারে না। কিছু বাকি আছেই,আপনাকে থাকতে হবে।” অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে রমণী বলিয়া উঠিলেন—“না, আমি আর পারব না। ছেলে-মেয়েরাও আমার কথা ভুলে এসেছে। তাদের কোনো সঙ্গ পাই না, দিতে পারি না, বুক ফেটে যায়। আমি আর ফিরব না। সবি তো বলেছি, তবে একটি কথা। তখন আমার বয়স কম। আমার প্রথম মেয়েটি হয়েছে। প্রসবের জন্য বাপের বাড়ি এসেছিলাম। মেয়েটি হবার পরেও বৎসর খানেক শ্বশুরবাড়িতে যাইনি। একদিন আমার বড় ভগ্নীপতি এসেছিলেন। তাঁর মতো সুপুরুষ আমার চোখে পড়েনি। একদিন দুপুরে তিনি চিঠি লিখ্‌ছিলেন। আমি হাত মেলে টিকিটে জল মাখিয়ে দিচ্ছিলাম—তিনি উঠিয়ে খামে লাগাচ্ছিলেন, আমার একবার মনে বড় ইচ্ছা হয়েছিল—যদি টিকিট ছেড়ে আমার হাতটি চেপে ধরতেন।”—

দ্রুতবেগে খেয়া ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে খেয়া লইয়া বন্ধু আবার ফিরিল—ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“এবার তোমার পালা।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম—"আর হয়তো কোনো-কালে তোমার সাথে দেখা হবে না, তবু তোমার সাথে আমার কথা ফুরোয় নি, কয়েকটি কথা জেনে নিই,—ওপারে কোথায় এদের দিয়ে আসো। আর নষ্টচরিত্রা এই নাচওয়ালী এত সহজে পার হল, আর এই মহিলাটির এই লাঞ্ছনা ?"

বন্ধুটি আবার হাসিয়া কহিল—"ওপারে পৌঁছালেই এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের সন্ধান না পাই এই জন্যই বোধ হয় এ কাজে দেহ ফিরে পাই।

"আর নাচওয়ালী,—ক্ষিদে না পেতে যে-শরীর খাদ্য পায়, সে যেমন কোনোকালে ক্ষিদে কী বস্তু জানে না, এই বহুপুরুষভুক্ত নারীও কোনোকালে সেইজন্য দেহ-অন্তর দিয়ে কোনো পুরুষকে চাইবার অবসর পায় নি। এর মাও ছিল নাচওয়ালী, ছোটবেলা থেকে ব্যবসায়ে ঢুকেছে। জানি না কী মনের সাধ বলেছে—হয়তো সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের ঘর-সংসার দেখে ওর মন তেমনি একটি ঘর চাইত। সবাই অবশ্য এর মতো নয় কিন্তু এ বারাঙ্গনা এ রাজ্যে চিরকুমারী।

"অন্যটির লাঞ্ছনা—তার নিজেরই কর্ম্মফল। মনের অতি গোপন কথাটিও এ নদীর কূলে মনে আসে। ছোটবেলার ছেলেমানুষি বলে যদি ভুলতে পারত, সহজেই বলে ফেলত —কিন্তু সেই একদিনের বাসনা ওর মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে—তারই জন্য সঙ্কোচ—এবার ওঠো।"

"উঠি, তার আগে কী বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব—

বন্ধু। শুধু ভাবি যা দেখলাম, যা শুনলাম সব নিয়ে যদি আবার জীবন পেতাম, তবে হয়তো—”

আর কথা শেষ করিতে হইল না। কোথায় গেল, বৈতরণী, কোথায় খেয়া, কোথায় কর্ণধার। আমি সেই রোগশয্যাতেই, পাশে ভগ্নীপতি। একবার ভাবিলাম এ বুঝি মৃত্যুর পরের আর এক খেলা। হয়তো পার হইয়া গিয়াছি—সেই লোকের কোনো নিয়মে আবার সব দেখিতেছি। কিন্তু তা তো নয়, ভগ্নীপতি আমার হাত তুলিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন—তারপর দিদিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিলেন —“আর ভয় নেই।”

আমি দুর্ব্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—“সত্যি আমি বেঁচে আছি?” ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিলেন—“সত্যি হে সত্যি, কিন্তু যাঁর জন্য বেঁচেছ, তিনি তোমার মাথার কাছে। আর যাই করো, আর কোনোদিন পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে দুপুর রাত্রি অবধি নদীর বুকে চাঁদের শোভা দেখো না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ক’দিন অজ্ঞান ছিলাম?”

দিদি কহিলেন—“সাতদিন।”

৫

তারপর একটু সুস্থ হইতেই প্রায় দুমাস গেল। তখন ভগ্নীপতি দেরাদুনে তাঁহার ভাইএর কাছে আমাকে পাঠাইলেন। ধীরে ধীরে শরীরে বল ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অনেক

সময়েই আনমনা হইয়া থাকিতাম। ভাবিলাম সত্যি সত্যিই কি একরকম মরিয়াছিলাম, না সবি স্বপ্ন—কিন্তু এত স্পষ্ট মনে হয় যে!—কখন কখনও ভাবিতাম সত্যই কি আমার বন্ধু সেই নির্জ্জনে এখনও খেয়া দিতেছে, এখনও কি সেই ব্রেজিলের লোকটি বিদেহী আত্মাদের লইয়া ছুটিতেছে।

অনেকদিন সুলেখাকে দেখি নাই—তাহাকে চিঠি দিতেও পারি নাই। ইদানীং তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে এত প্রবল হইয়া উঠিত, যে সেইদিনই অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। ভগ্নীপতি ছয় মাস থাকিতে বলিয়াছিলেন। চার মাস না ফুরাইতেই কলিকাতায় ফিরিলাম।

প্রথমদিনই সন্ধ্যাবেলায় গেলাম সুলেখাকে দেখিতে। একটু পরেই নীচে বসিবার ঘরে একখানি বই হাতে করিয়া নামিয়া আসিল। চোখের নীচে কী কালি, কী কৃশ হইয়া গিয়াছে। বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, ভাবিলাম মনে মনে এই নীরব দুঃখিনী মেয়েটি শুধু একটু ভালোবাসার আশায় আমার কত অত্যাচার সহিয়াছে—আর আমি কত অবিচার করিয়াছি।

আমার অসুখের সকল সংবাদ দিতেছি, এমন সময়ে তাহাদের পুরাতন ঝি একটি রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল "নাও দিদিমণি, এ কিছুতেই থাকবে না আমার কাছে।" "তবে মার কাছে দিয়ে আয়" বলিয়া সুলেখা আমার চোখে বিস্ময় দেখিয়া কহিল—"দু-মাস হল আমার একটি বেবি হয়েছে।"

চোখের কালির মাহাত্ম্য আর রহিল না। মনটা যেন কঠিন হইয়া উঠিল। এমন সময়ে স্থলেখা আমার পাশের চেয়ারে আসিয়া বসিয়া কহিল—"আজ ক'দিন হল, এই বইটা পড়ছি। ক্রিষ্টিনা রসেটির কবিতা—কী সুন্দর এটা শুনুন—বলিয়া তাহার মিষ্ট, মৃত্ব কণ্ঠে পড়িতে লাগিল—

"Come to me in the silence of the night ;
Come in the speaking silence of a dream ;
Come with soft rounded cheeks
and eyes as bright
As sunlight on a stream ;
Come back in tears ;
O memory, hope, love of finished years.

O dream how sweet, too sweet, too bitter sweet,
Whose wakening should have been in Paradise,
Where souls brimfull of love abide and meet ;
Where thirsting longing eyes
Watch the slow door
That opening, letting in, lets out no more.

Yet come to me in dreams, that I may live
My very life again though cold in death,
Come back to me in dreams, that I may give

Pulse for pulse, breath for breath :
Speak low, lean low
As long ago, my love, how long ago.

—That opening, letting in, lets out no more —কী সুন্দর লাইনটি !" তারপর স্বর নামাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া ক্লান্ত শিরটি আমার বুকে রাখিয়া ছলছল চোখে কহিল—"সবি তো জানো,তবে কেন অভিমান করো। নিষ্ঠুর ! কতদিন খবর পাইনি উঃ কতদিন,"—বলিতেই তার ঘন চোখের পাতা হইতে দু-ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সেই সিক্ত পল্লবে দুটি চুম্বন করিতেই সকল জ্বালা যেন জুড়াইয়া গেল, কহিলাম, "সুলেখা"—হঠাৎ একটা দমকা বাতাস যেন কানে কানে কহিয়া গেল "মূর্খ, মূর্খ"।